দেশবিদেশের লেখা

# জননী

( ম্যাকসিম গর্কি )

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

দেশবিদেশের লেখা—
তৃতীয় খণ্ড
প্রথম প্রকাশ —১৩৫৭

শিল্পী ঃ
শ্রীঅরুণ গুপ্ত

প্রকাশক ঃ
শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রক ঃ
শ্রীরণজিৎ সামুই
বাণী-শ্রী প্রিণ্টার্স
৮৩ বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

সর্বকালের

নির্য্যাতিত পুত্রকন্যার বেদনাহত মায়েদের

স্মরণ করি—

## ম্যাক্‌সিম্‌ গর্কি

রাশিয়ার ভল্‌গা নদীর তীরে এক শহর নিঝ্‌নি নভ্‌গোরড, সেখানে এক ছুতোরের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন আলেক্‌সি ম্যাকসিমোভিচ পেশকভ। ১৮৬৮ সালের ২৮শে মার্চ।

দশ বছরের সময় বাবা মারা যান। দিদিমা মেয়ে ও নাতিকে নিয়ে আসেন নিজের কাছে। দাদুর রংরেজের কারখানা ছিল। মেজাজটা ছিল খুব কড়া। বাড়ীর ছেলেরা কোন কিছু অন্যায় করলে তিনি তাদের ধরে বেত মারতেন। এক শনিবারে দুষ্টুমি করার জন্য আলেক্‌সিকে তিনি এমন বেত মারলেন যে আলেক্‌সি অজ্ঞান হয়ে গেল, তারপর বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে রইল কয়েকদিন। কিন্তু তা বলে দাদু যে নাতিটিকে কম ভালবাসতেন তা নয়, তখনকার দিনে ছোটদের অমন ভাবে মেরে-ধরে শায়েস্তা রাখাই ছিল ওদেশের রীতি।

আলেক্‌সিকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন তার দিদিমা।

বাড়ীতে তুই মামা ও দাদামশাইয়ের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হতো। দাত্থ প্রায়ই দিদিমাকে মারধোর করতেন, মামারা মারতো মামীদেরকে। ছোট মামা ছোট মামীকে মেরে, মেরে ফেলেছিল।

দিদিমা খুব ভাল গল্প বলতে পারতেন, প্রতি রাতে তিনি নাতিকে নানা গল্প বলতেন।

একদিন দাত্থর কারখানায় আগুন লেগে সব পুড়ে গেল। দাত্থ অন্য বাড়ীতে চলে এলেন।

দাত্থ আলেক্‌সিকে প্রথম ভাগ পড়াতে স্থরু করলেন। আর বড় মামী স্থরু করলেন উপাসনার স্তোত্র মুখস্থ করাতে।

এখানে বড় মামা মদ খেয়ে এসে প্রায়ই দাত্থর সঙ্গে মারামারি করতো। পাড়ার লোকেরা ছুটে এসে সেই ঝগড়া মেটাতো।

সে বাড়ী ছেড়ে দাত্থ এলেন আরেক বাড়ীতে, সেখানে কয়েক ঘর ভাড়াটে ছিল, তাদের সঙ্গে আলেক্‌সির ভাব হলো। এক ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান ছিল—পিয়াতর ও তার ভাইপো। ভাইপোটা ছিল বোবা। কিন্তু একদিন পুলিশ এসে ভাইপোকে ধরলো, বললো —ও অমন বোবা সেজে থাকে আর দল বেঁধে গির্জায় ডাকাতি করে। পিয়াতর সেই রাত্রেই গলায় ছুরি বসিয়ে আত্মহত্যা করলো।

এখানে প্রতি রবিবারে ভোজের আয়োজন হতো। কত গান গল্প হোত সেই মজলিসে।

আলেক্‌সির একবার বসন্ত হয়েছিল, একলা ঘরে সে শুয়েছিল। নীচে সেদিন ভোজের মজলিশ বসেছে। হঠাৎ আলেক্‌সির কেমন যেন মনে হলো, তার দিদিমা মারা গেছে। দিদিমার কাছে যাবার জন্য সে ঘর থেকে বেরুতে গেল, দেখে দরজা বন্ধ। জানালার কাঁচ ভেঙে সে নীচে লাফিয়ে পড়লো। বাইরে তখন বরফ পড়ছে। কেউ জানলো না, সেই বরফের মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে আলেক্‌সি পড়ে রইল অনেকক্ষণ। সেবার তিনমাস তাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল, পা তুটি একেবারে অকেজো হয়ে গিয়েছিল।

এই সময় মা আবার বিয়ে করেন, করে অন্যত্র চলে যান।

একজন লোক দাদুর কাছ থেকে অনেক টাকা ধার নিয়ে সব মেরে দেয়। অর্থাভাবে দাদু বাড়ী বিক্রী করে দেন, জিনিষপত্র বিক্রী করে দেন, তারপর উঠে যান এক ভাড়াটে বাড়ীতে। দাদু দিদিমাকে বললেন—আমি আর তোমাকে খাওয়াতে পারবো না।

দিদিমার সঙ্গে আলেক্সি এলো মায়ের কাছে। চার মাইল দূরে সরমভোতে এক কারখানায় সৎ-বাবা চাকরি করতেন, সেখানে।

এখানে মা তাকে এক ইস্কুলে ভর্তি করে দেন।

ইস্কুলে সহপাঠীদের মুখে আলেক্সি শুনলো যে রবিনসন ক্রুশো গল্পটি খুব ভাল। সেই দিনই সৎ-বাবার একখানি বইয়ের পাতা ওলটাতে তার মধ্যে দেখতে পেলে একখানি এক রুবলের নোট। নোটখানা নিয়েই সে বেরিয়ে পড়লো রবিনসন ক্রুশো বইখানি কিনতে। কিন্তু বইখানার মলাট দেখে ভাল লাগলো না, সে কিনে আনলো এণ্ডারসেনের গল্পের বই। কিন্তু সেই বই বাড়ী এনে আর পড়া হলো না। প্রথমে টাকা নেবার জন্য মায়ের কাছে মার খেতে হলো। তারপর মা বইখানা কেড়ে নিলেন। সে বই আর পাওয়া গেল না। তার উপর সৎবাবা ইস্কুলে গিয়ে সব ছেলেদের কাছে বলে এলেন—আলেক্সি চোর, টাকা চুরি করেছে।

একদিন আলেক্সি দেখলো সৎবাবা জুতো শুদ্ধ লাথি মারছেন মায়ের বুকে। আলেক্সি এতটা সইতে পারলো না, সামনে একখানি রুটিকাটা ছুরি পড়েছিল, সেইটা নিয়ে মারলো সৎবাবাকে। মা চট্ করে সৎবাবাকে ঠেলে সরিয়ে না দিলে, সেদিন সৎবাবা রক্ষা পেতেন না। আলেক্সি মাকে বললো—তোমাকে এই ভাবে মারলে আমি ওকে খুন করবো, তারপর নিজে খুন হয়ে মরবো।

তারপর আর মায়ের কাছে থাকা চললো না। আলেক্সি চলে এলো দাদুর কাছে। দাদু বললেন—আমি তোকে খাওয়াতে পারবো না।

দিদিমা বললেন—আমি খাওয়াবো।

দিদিমা তখন নিজের খাই-খরচ নিজেই জোগাড় করেন। তিনি সূচের কাজ জানতেন, তা থেকে পয়সা পেতেন।

আলেক্সিও পয়সা রোজগার করতে চেষ্টা করলো। ইস্কুল থেকে বাড়ী ফিরে সে রোজ থলি নিয়ে বেরায়, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ন্যাকড়া, ছেড়া কাগজ, পেরেক, কুড়িয়ে আনে, তা-ই বেচে কিছু কিছু পয়সা পায়।

তারপর সুরু হলো নদীর ধারের কাঠগোলা থেকে কাঠ চুরি করে এনে লুকিয়ে বিক্রী করা।

ব্যাপারটা ইস্কুলে জানাজানি হয়ে গেল। তারা আলেক্সির পিছনে লাগলো। কিন্তু পরীক্ষায় আলেক্সি খুব ভালভাবে পাস করে পুরস্কার পেলে। আলেক্সি মাষ্টারদের নজরে পড়ে গেল।

তারপর একদিন মা ক্ষয় রোগে মারা গেল। আলেক্সির বয়স তখন মাত্র দশ বছর।

মামাতো ভাই চাকরি করতো এক জুতোর দোকানে। দাদামশাই সেখানেই আলেক্সির একটা চাকরি করে দিলেন। সেখানে তার কাজ হলো, ভোরবেলা বাড়ীর লোকের জামাকাপড় জুতো সাফ করা, তার পর উনানের কাঠ বহে আনা, চা গরম করার 'সামোভার' ধরিয়ে রাখা। তারপর দোকানে গিয়ে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকা। একদিন রান্নাঘরে ঝোল গরম করতে গিয়ে ঝোলের কড়াটা তার হাতে উল্টে পড়লো, সেখান থেকে হাসপাতাল যেতে হোল এবং পরদিন সেখান থেকে দিদিমার কাছে। দাদু বললেন—চাকরি তো গেল, এখন খাবে কি?

দিদিমার চলতো সূচের কাজ করেই। তাছাড়া দিদিমা যেতেন বনে, সহরের পাশেই বন, সেখান থেকে তিনি লতা-পাতা, শিকড়-বাকড় যোগাড় করে এনে বাজারে বেচতেন। আলেক্সিও যেতো দিদিমার সঙ্গে। একবার তো দু'জনে সেই বনের মাঝে নেকড়ে বাঘের সামনে পড়েছিল।

এই সময় বন্ধুদের সঙ্গে বাজী রেখে আলেক্সি সারা রাত একা কবরখানায় কাটিয়েছিল। তখন তার বয়স মাত্র এগারো বছর।

দাদু গাল দিতেন—কুঁড়ে অকেজো, বসে বসে খাচ্ছিস্!

দাদু আবার একটা চাকরি করে দিলেন দিদিমার বোনের বাড়ীতে। সেখানে চাকরের কাজ করতে হতো, কাঠ কাটা, বাসন মাজা, বাজার করা, জামাকাপড় কাচা, 'সামোভার' ধরানো। কিন্তু সে বাড়ীতে শান্তি ছিল না, গৃহিণীর সঙ্গে পুত্রবধূর রোজ ঝগড়া হতো।

গৃহিণীর ছেলে ছিল ড্রাফ্‌ট্সম্যান, কথা ছিল আলেক্সি তার কাছে নক্সা আঁকা শিখবে। কিন্তু তাকে শেখাতে বললেই গৃহিণী এসে ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করতো।

শেষে মনে মনে বিরক্ত হয়ে একদিন আলেক্সি সেখান থেকে পালালো।

এবার আলেক্সি চাকরি নিলে এক জাহাজে। কাজ ডিশ ধোওয়া। এখানে তার উপরওয়ালা ছিল রাঁধুনি স্মিউরি। স্মিউরির কাছে ছিল অনেক বই, সেই সব বই পড়ে পড়ে স্মিউরিকে শোনাতে হতো।

জাহাজের খালাসীরা অনেক সময় জাহাজের বাসন চুরি করে যাত্রীদের কাছে বেচে দিত। সেই চুরি যখন ধরা পড়লো, তখন সব দোষ গিয়ে পড়লো আলেক্সির উপর। তার চাকরি চলে গেল। এই জাহাজে আলেক্সি ছুটো নেশা শিখেছিল,—বই পড়া আর সিগারেট খাওয়া।

এবার আলেক্সি আরেক পেশা ধরলো। বনে গিয়ে ফাঁদ পেতে পাখী ধরা। দিদিমা সেই পাখী বেচে আসতেন সহরে। দাদুর কিন্তু এটা পছন্দ নয়, দাদু আবার তাকে ভর্তি করে দিলেন দিদিমার বোনের বাড়ীতে। এবার আলেক্সি অবকাশ পেলেই বই পড়তো, আর সে বই চেয়ে আনতো এক প্রতিবেশী মহিলার কাছ থেকে। কিন্তু গৃহিণী দেখতে পেলেই সেই বই কেড়ে নিত।

আলেক্সি রাত জেগে বই পড়তো। গৃহিণী মোমবাতি মেপে

রেখে যেতেন। রাতে বাতি জ্বালা চলতো না। আলেক্‌সি চাঁদের আলোয়, নয়তো ঠাকুর-ঘরের আলোয় বই পড়তো। গৃহিণী-বুড়ি বই দেখতে পেলেই ছিঁড়ে তচনচ করে দিত।

আলেক্‌সি রুটির দোকান থেকে বই আনত। বই পিছু ভাড়া দিতে হতো এক 'কোপেক'। ভাড়াটা কিছুই নয়, কিন্তু বুড়ি বই ছিঁড়ে দিলে দাম দিতে হতো। এই ভাবে অনেক পয়সা জমে গেল। কি ভাবে সেই পয়সা শোধ করবে সেই হলো এক ভাবনা। একদিন আলেক্‌সি মনিবকে সব কথা বললো—মনিব তখনই পয়সাটা দিয়ে দিলেন, আর তারই সঙ্গে আলেক্‌সির উপর ভার দিলেন কাগজ পড়ে শোনাবার। আলেক্‌সি তাকে প্রতিদিন 'মস্কো লিফলেট,' 'পিকচার রিভিউ', 'অগ্নিশিখা প্রভৃতি পত্রিকা পড়ে শোনাতো। শুধু গল্পের বই ছাড়া এবার অন্যান্য কথাও পড়ার সুযোগ হলো আলেকসির।

ইতিমধ্যে একদিন 'সামোভারে' আগুন দেয়া নিয়ে বাড়ীর গিন্নী আলেক্‌সিকে চেলা কাঠ দিয়ে মারলো। কাঠের টুকরো বিঁধে গেল সারা গায়। তখনই হাসপাতালে যেতে হলো। ডাক্তার বিয়াল্লিশটি চেলা কাঠের টুকরো বের করলো আলেক্‌সির দেহ থেকে। ডাক্তার বললেন—পুলিসে নালিশ কর !

আলেক্‌সি কিছুই করলো না। তার ফলে এবাড়ীতে এবার থেকে আলেক্‌সির বই পড়ার আর কোন বাধা রইল না।

এবার একদিন এক সহিসের টাকা চুরি গেল, আর একজন সহিস বললে—টাকা চুরি করেছে আলেক্‌সি। বাড়ীর গিন্নী আলেক্‌সিকে ধরে বেদম প্রহার দিলেন। তার পরেই জানা গেল আলেক্‌সি টাকা চুরি করেনি।

আলেক্‌সি কিন্তু আর সে বাড়ীতে রইল না।

আলেক্‌সি আবার এক জাহাজে ডিশ ধোবার কাজ নিলে।

কিন্তু শীতকালে সে কাজ রইল না। নদীতে বরফ জমে, জাহাজ চলে না।

আলেক্‌সি এক পটুয়াদের কারখানায় কাজ নিলে। সকালে

দোকানে কাজ করা আর বিকালে কারখানায় ফাই-ফরমাস খাটা। রাতে এই পটুয়াদেরকে সে বই পড়ে শোনাতো।

এই সময় পুরানো মনিব এসে বললো—মেলায় ঘর করার কনট্রাক্ট পেয়েছি, তুমি চল কুলি খাটাবে।

আলেক্সি তার সঙ্গে চলে গেল।

এখানে কয়েকজন ইস্কুলের ছেলের সঙ্গে তার ভাব হলো আর সেই সঙ্গে দেখা হলো সৎ-বাবার সঙ্গে। সৎবাবা তখন সেখানেই কাজ করতেন। কিছুদিনের মধ্যে সেখানেই সৎবাবা ক্ষয় রোগে মারা গেলেন।

ইস্কুলের ছাত্রেরা তাকে ইস্কুলে পড়তে বললো। ষোল বছর বয়সে আলেক্সি চলে গেল কাজান শহরে, পড়াশুনা করবার ইচ্ছায়। কাজান শহরে এসে আলেক্সি দেখলো, লেখাপড়া করা তো অনেক দূরের কথা, এখানে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকাই শক্ত। আলেক্সি জাহাজের ডকে কুলিগিরি সুরু করলো। দৈনিক কুড়ি কোপেকের মত রোজগার হয়, তাতে কোনমতে দিন চলে।

এক পুরানো ভাঙাচোরা বাড়ীর সিঁড়ির নীচের এক খুপ্রি ঘরে সে থাকে। সে বাড়ীতে নানা ধরণের মানুষের বাস। চোর জুয়াচোর পকেটমার দাগী আসামী, বাউণ্ডুলে লোক, গরীব ছাত্র সবাই থাকে সেখানে। এইখানে এক মুদীখানায় বিপ্লবীদের আড্ডা ছিল। সেখানে অনেক বই ছিল, আলেক্সি সেই বই পড়তো।

আবার শীতকালে এলো। ডকে জাহাজ আসা বন্ধ। কাজও বন্ধ। এবার আলেক্সি এক বাগানের মালী ও দরোয়ান হলো।

তারপর গির্জার গায়কদলে কিছু দিন গান গাইল।

তারপর কাজ হলো রুটির দোকানে। এখানে প্রতিদিন চৌদ্দ ঘণ্টা করে কাজ করতে হতো। তারপরেও চলতো নিজের পড়াশুনা। সেখানে থেকে আলেক্সি গেল আর এক রুটির কারখানায়। এখানে বিপ্লবীদের যোগাযোগ ছিল। আলেক্সিও তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লো।

এই সময় অভাবের তাড়নায় দিদিমা পথে পথে ভিক্ষে করতেন। একদিন পা পিছ্‌লে পড়ে গিয়ে তাঁর একটি পা ভেঙে যায়। সেই পায়ে ঘা হয়, তা থেকেই তিনি মারা যান। দিদিমার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে আলেক্‌সির মনে বড় কষ্ট হলো। তিন রুবল দিয়ে একটা পিস্তল কিনে কাজানকা নদীর তীরে বরফের উপর সে নিজেকে গুলি করলো। বাঁ দিকের ফুসফুসে গুলি লাগালো।

আলেক্‌সি কিন্তু মরলো না। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে দেখতে পেয়ে, হাসপাতালে পাঠানো হলো। সেখানে ধীরে ধীরে সে সুস্থ হয়ে উঠলো।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তার সঙ্গে আলাপ হলো এক তরুণ বিপ্লবীর সঙ্গে। সে গাঁয়ে গিয়ে একখানি দোকান খুলে বসলো। আলেক্‌সি হলো তার সহকারী। দোকানদারীর চেয়েও সেখানে বড় কাজ ছিল কৃষকদের মাঝে বিপ্লবী চিন্তা প্রচার করা।

এই দোকানে জিনিষপত্রের দাম কম, সেইজন্য অন্য দোকানদার তাদের শত্রু হলো। দোকানে আগুন লাগলো। আলেক্‌সি কোন মতে জীবন্ত পুড়ে মরা থেকে রক্ষা পেল। তারপর গ্রামের লোকেরা মেরে তাদের গ্রাম ছাড়া করলো।

আলেক্‌সি ফিরে এলো কাজান শহরে। কিন্তু কোন কাজ মিললো না।

এবার দবরিংকা নামে এক রেল-স্টেশনে পাহারাওলার চাকরি হলো। সারা রাত রেল গোদাম পাহারা দেওয়া। এক রাতে বরফের ঝড়ে রেল-লাইনের উপর সে মূর্ছা যায়। তার ফলে কণ্ঠস্বর চিরদিনের মত কর্কশ হয়ে যায়।

সেখান থেকে এলেক্‌সি বদলি হলো আরেক স্টেশনে।

সেখান থেকে আরেক স্টেশন। এবার প্রমোশন হলো। পাহারাদার আর নয়, মালের ওজনদার।

এখানকার কাজ ভাল লাগলো না, আলেক্‌সি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এলো মস্‌কো।

মসকো থেকে নিঝ্‌নি। পুলিশ তাকে বিপ্লবী সন্দেহে গ্রেপ্তার করলো। কিন্তু পাখী সম্পর্কে আলেক্‌সির বিচিত্র জ্ঞানের জন্য পুলিশের বড়কর্তা জেনারেল পজনানস্কি আলেক্‌সির সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতেন। পুলিশ আলেক্‌সির কাছে একখানি নোটবুক পায়, তাতে অনেক কবিতা লেখা ছিল, সেগুলি পড়ে জেনারেল বললেন—তুমি তো বেশ লিখতে পার, লেখাগুলো করলেংকোকে দেখাও না?

করলেংকো বিখ্যাত লেখক, নিঝনিতেই থাকতেন।

মাসখানেক বাদে পুলিশ ছেড়ে দিল, আলেক্‌সি আবার কুলির কাজ সুরু করলো।

তারপর চাকরি জুটলো এক এটর্নি আপিসের কেরাণীগিরি।

এবার একদিন আলেক্‌সি কবিতার খাতা নিয়ে গেল করলেংকোর কাছে। করলেংকো কবিতাগুলি পড়ে বললেন—বড্ড বানান ভুল, তবে লেখার ক্ষমতা আছে। যে বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতা আছে—তাই লেখো।

আলেক্‌সি এবার লেখাই বন্ধ করে দিলে।

এক গ্রীষ্মের রাত্রে ভল্‌গা নদীর তীরে আবার কারলেংকোর সঙ্গে দেখা হলো। কারলেংকো বললেন—নতুন কি লিখলে?

—লেখা বন্ধ করে দিয়েছি।

—তোমার লেখা উচিত ছিল!

কিন্তু তখন আর কিছু লিখবে না বলে আলেক্‌সি মনস্থির করে ফেলেছে।

আলেক্‌সির মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। আপিসের কাজে ভুল হতে লাগলো। রাতে ঘুম হয় না। আলেক্‌সি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লো দেশভ্রমণে।

আলেক্‌সি এলো জারিৎসিনে, ( স্তালিনগ্রাদ )।

তারপর ইউক্রেন পার হয়ে চলে গেল ওডেসা।

সেখান থেকে জর্জিয়া।

এই হাজার হাজার মাইল পথ সে পাঁয়ে হেঁটে ঘুরলো দু'বছর

ধরে। কোনদিন খাওয়া জুটতো, কোনদিন জুটতো না। কখনো ক্ষেতখামারে কাজ করতো, কখনো রাঁধুনির কাজ, কখন বা কুলিগিরি।

একবার এক গাঁয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় গ্রামবাসীরা তাকে বেদম প্রহার দিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় পথে ফেলে রেখে চলে যায়। তারপর বেশ কিছুদিন তাকে হাসপাতালে থাকতে হয়।

এক গ্রামে চাষীদের উপর পুলিশ গুলি চালিয়েছিল। আলেক্সি সেখানে যেতেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। কিছুদিন তাকে জেল-খানায় থাকতে হলো।

জর্জিয়ার রেলকোম্পানির স্টোরে এক কেরাণীর কাজ জুটলো। সেখানে আলাপ হলো কলি-উঝনি নামে এক বিপ্লবীর সঙ্গে। কলি-উঝনি বললেন—তোমার জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে গল্প লেখো।

আলেক্সি লিখলো একটি গল্প—মাকার চুদ্রা। কলি-উঝনি গল্পটি পাঠিয়ে দিলেন এক সম্পাদকের কাছে। গল্পটি ছাপা হয়ে গেল। লেখক হিসাবে আলেক্সি ছদ্মনাম নিলেন—মাকসিম গর্কি, অর্থাৎ তিক্ত ম্যাকসিম।

সুরু হলো লেখক জীবন। কেরাণীগিরির অবকাশে একটির পর একটি গল্প লিখে চললেন গর্কি। করলেংকো তাঁর লেখা পড়ে খুসি হলেন। তিনি গর্কিকে এক চাকরি করে দিলেন সামারার এক পত্রিকায়। মাসিক মাইনে হলো ছু'শো রুবল।

এখানে বছর খানেক কাজ করার পর গর্কি গেলেন আর এক পত্রিকায়।

একটি মেয়ে পত্রিকার প্রুফ দেখতো—কাতেরিনা পাভ্‌লোভ্‌না ভলঝিনা। গর্কি তাঁকে বিয়ে করলেন।

এবার গর্কির ক্ষয় রোগ দেখা দিল। বিশ্রাম ও চিকিৎসার জন্য অর্থের প্রয়োজন। সাহায্য করলেন এক তরুণ সাংবাদিক ভ্লাদিমির পস। গর্কি চলে গেলেন ক্রিমিয়া।

সেখান থেকে ইউক্রেন।

ইতিমধ্যে পসের চেষ্টায় গর্কির দু'খানি গল্পের বই বেরুলো। এক বছরের মধ্যে বই দু'খানির দুটি সংস্করণ শেষ হলো। তার পর প্রতি বছরে লক্ষ কপি। গর্কি সেরা লেখক হিসাবে নাম করলেন।

এই সময় পুলিশ আবার গর্কিকে গ্রেপ্তার করলো। কিন্তু কোন দোষ প্রমাণ হলো না। পসের চেষ্টায় গর্কি তাড়াতাড়ি মুক্তি পেলেন।

এবার গর্কির সঙ্গে টলস্টয়ের পরিচয় হলো।

সেণ্ট পিটার্সবার্গে ছাত্রদের উপর পুলিশ হামলা করলো। গর্কি তার প্রতিবাদ করলেন। পুলিশ গর্কিকে গ্রেপ্তার করলো। গর্কির স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লো। তখন টলস্টয়ের চেষ্টায় গর্কি কিছুদিন ক্রিমিয়ায় থাকবার অনুমতি পেলেন। ক্রিমিয়ায় পৌছলে জনতা গর্কিকে অভিনন্দন জানালো—গর্কি দীর্ঘজীবী হোক্!

রুশ বিজ্ঞান-পরিষদ গর্কিকে সদস্য মনোনীত করলেন। অভিজাতরা চমকে উঠলো, এ কি? যে মানুষ পথে কাগজ কুড়াতো, কুলি-মজুরের কাজ করেছে, সে হবে পরিষদের মাননীয় সদস্য। সম্রাট জার বললেন-- সত্যিই তো!

তখনই গর্কির নির্বাচন বাতিল করে দেওয়া হলো। এর প্রতিবাদে শেখভ ও করলেংকো পরিষদের সদস্য-পদ ত্যাগ করলেন।

১৯০৩ সালে গর্কির একখানি নাটক গ্রিবয়েদিভ পুরস্কার পেল।

১৯০৫ সালে পাদ্রী জর্জি গাপন শ্রমিকদের এক মিছিল বের করেন সেণ্ট পিটার্সবার্গে। সৈন্যরা সেই মিছিলের উপর গুলি চালায়। গর্কি ছিলেন তখন সেখানে। তাঁর পাশেই একটি লোক গুলি খেয়ে মারা যায়। গর্কি তখনই দেশবাসীর উদ্দেশে একটি বিবৃতি দেন। পুলিশ গর্কিকে গ্রেপ্তার করে। জেলে আবার ক্ষয় রোগ দেখা দিল। দশ হাজার রুবলের জামিনে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলো। মুখ দিয়ে তখন রক্ত উঠছে। বন্ধুরা তখন তাঁকে ক্রিমিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন।

একটু সুস্থ হয়ে গর্কি ফিরে এলেন রাজধানীতে। বিপ্লবীদের জন্য তিনি টাকা তুলতে সুরু করলেন।

তারপর চলে গেলেন ফিনল্যাণ্ডে।

সেখান থেকে জার্মানি।

তারপর ফ্রান্স।

তারপর আমেরিকা।

সর্বত্রই তিনি সমাদর পেলেন ও বিপ্লবের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে লাগলেন।

দেশে আর ফিরতে পারলেন না। ইতালির কাপ্রি দ্বীপে বাস করতে লাগলেন।

এই সময় তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'মা' লেখেন।

১৯১৩ সালে রুশ সম্রাট গর্কির সব অপরাধ ক্ষমা করেন। পরের বছর গর্কি দেশে ফিরে যান।

এই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধালো। গর্কি ছিলেন যুদ্ধের বিরোধী।

যুদ্ধ শেষ হবার আগেই 'জার' নিহত হলেন। বলশেভিকরা শাসন-ক্ষমতা পেল। গর্কি নতুন আদর্শে দেশকে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

আবার ক্ষয় রোগ প্রবল হলো। গর্কি চলে গেলেন ইতালিতে। ১৯২৮ সালে গর্কির ৬০ তম জন্মবার্ষিকী হলো সোভিয়েট দেশে।

১৯৩৬ সালে আবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ১৯শে জুন তাঁর মৃত্যু হলো। তাঁকে স্মরণীয় করে রাখলেন সোভিয়েট সরকার, তাঁর জন্মস্থান নিঝনি-নভগোরড-এর নাম হলো 'গর্কি'।

বিচিত্র জীবন। সমাজের নীচু তলার এই মানুষটি জগতের এক শ্রেষ্ঠ মানুষের স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন, এমনটি আর দেখা যায় না। গরীব সাধারণ মানুষকে ইনি যেভাবে চিনেছিলেন, তেমন ভাবে আর কেউ জানেননি, আর সেই অভিজ্ঞতা তিনি প্রকাশ করেছিলেন তাঁর সাহিত্যে। সেই সাহিত্যই তাঁকে জগৎ-সভায় অমরতা দিয়েছে।

গর্কির সব-সেরা উপন্যাস 'মাদার'। পৃথিবীর বহুভাষায় এই বইখানির অনুবাদ হয়েছে। বাংলাতেও একাধিক অনুবাদ আছে। আমাদের এই বইখানি ছোটদের জন্য তারই সংক্ষেপিত সংস্করণ।

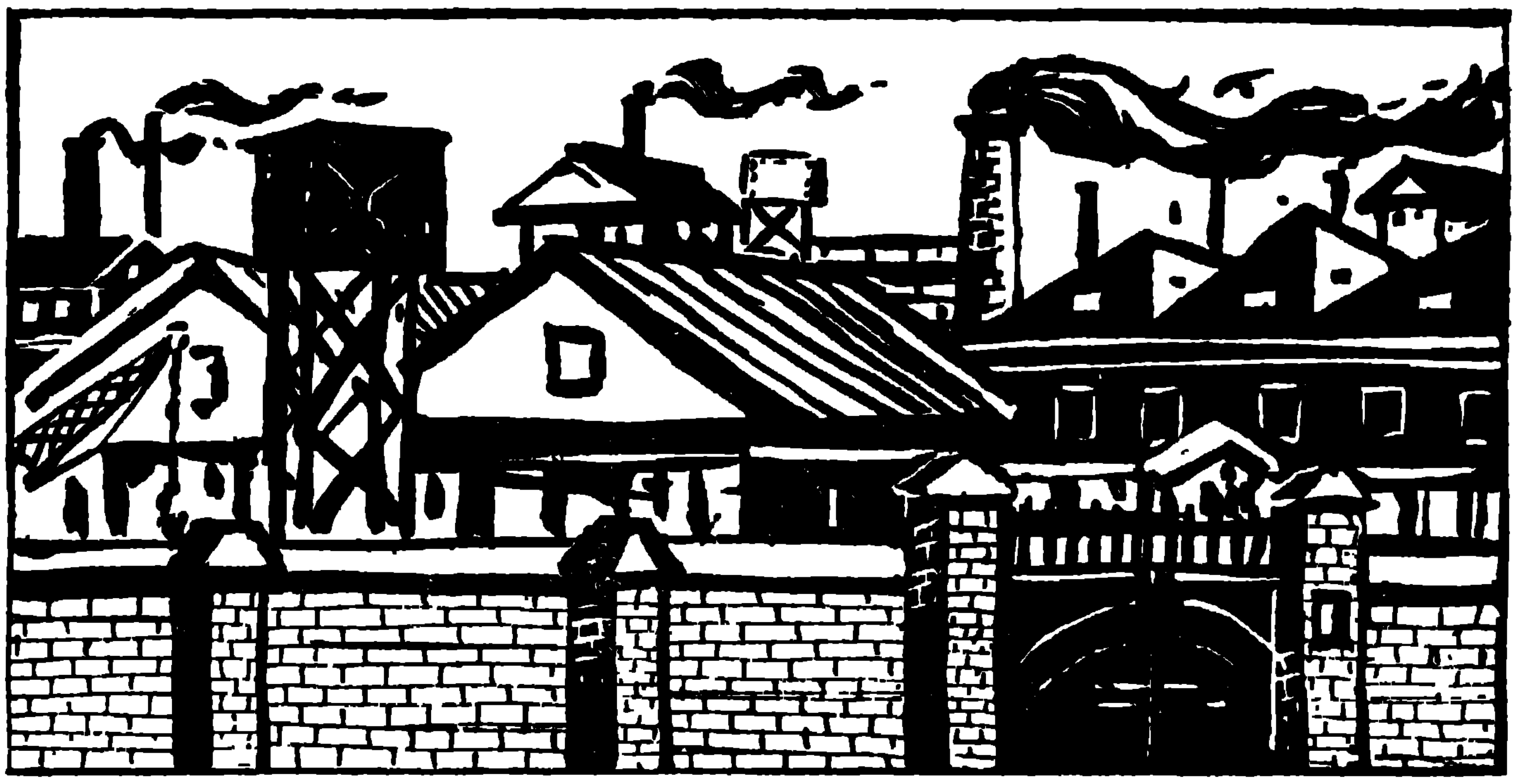

## জননী

মজুর পল্লী। খোয়া-বের করা সংকীর্ণ একটি পথ, ছ'পাশে সারি সারি ছোট ছোট নোংরা দুর্গন্ধময় কুঠরি, জানালা দরজাগুলি ছেঁড়া, ময়লা, দুর্গন্ধময় কাপড় দিয়ে ঢাকা।

সারা গ্রাম যখন ঘুমায়, আকাশে যখন শেষ রাত্রির অন্ধকার লেগে থাকে তখন কারখানার ভোঁ বাজে। তীক্ষ্ণ দীর্ঘ শব্দ বহুদূরে ভেসে যায় ভোরের বাতাসে, মজুরদের ঘুম ভেঙে যায়। ছোট ছোট কুঠরিগুলি থেকে তারা বেরিয়ে আসে। চোখ থেকে তখনও তাদের ঘুমের জড়তা কাটেনি। পরনে ময়লা পোষাক, পায়ে ছেঁড়া জুতো, রুক্ষ মুখ, লাল চোখ। সংকীর্ণ খোয়া বের করা পথটির উপর দিয়ে তারা এগিয়ে যায় কারখানার দিকে। কারখানার ধোঁয়া আকাশকে ঢেকে দেয়। মজুরের দল কারখানায় ঢোকে। কল চলতে সুরু করে। ঘরঘর শব্দে সব কিছু ডুবে যায়।

দিন শেষ হয়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। মজুরদের ছুটি হয়। মজুরেরা দলে দলে বেরিয়ে আসে। ক্লান্ত দেহ, ধোঁয়ায় ধূলায় তেলে মলিন। চোখে ক্লান্তি, পেটে ক্ষুধা। তবু মনটা তাদের খুসি, একটা দিনের দাসত্বের শেষ হলো, এখন ঘরে গিয়ে ক্লান্ত দেহটাকে ঘুমিয়ে চাঙ্গা করে নেওয়া যাবে।

ছুটির দিনে তারা ঘুমায় বেশী। তারপর যে-যার ভালো পোষাক পরে যায় গির্জায়। গির্জা থেকে ফিরে এসে আবার সন্ধ্যা পর্যন্ত

ঘুমায়, সন্ধ্যার পর পথের উপরেই বসে আড্ডা—কারখানার যত গল্প আর উপরওয়ালাকে গালাগালি। তারপর ঘরে ফিরে এসে স্ত্রীর সঙ্গে করে ঝগড়া, কখন কখন দু-এক ঘা প্রহারও দেয়।

যুবকের দল আড্ডায় গিয়ে মদ খায়, নাচে, অশ্লীল গান গায়, মারামারি করে, জামাকাপড় ছিঁড়ে মারের চিহ্ন গায় নিয়ে অনেক রাতে বাড়ী ফেরে। অনেক সময় বাপ-মা তাদের মাতাল অবস্থায় পথ থেকে তুলে আনে, গাল-মন্দ দেয়, মারে, আবার পরদিন ভোরে কারখানার ভোঁ বাজলেই ঘুম ভাঙিয়ে পাঠিয়ে দেয় কারখানার কাজে।

জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি একটানা উদ্দেশ্যহীন জীবন। কিসের যেন একটা অসন্তোষ অন্তরে জমে থাকে, সামান্য ব্যাপারেই তাই অনেক সময় বেধে যায় মারামারি রক্তারক্তি কাণ্ড, কিন্তু জীবনের এই একঘেয়েমিকে ঠেলে ফেলার—আনন্দময় করে তোলার অবকাশ তাদের নেই।

কখন কখন নতুন মজুর বিদেশের কথা বলে, আর সবাই কৌতূহল নিয়ে দু' চার দিন শোনে, বুঝতে পারে দুনিয়ার সব জায়গাতেই মজুরদের অবস্থা একই রকম। তবে মাঝে মাঝে দু-একজন লোক এসে নতুন কথাও বলে—উন্নত জীবনের কথা। কিন্তু তারা আশাই করতে পারে না যে তাদের এই জীবনকে উন্নত করা যায়। তাদের এই জীবন-ধারা তাদের অস্থি-মজ্জার সঙ্গে মিশে গেছে, এটা বদলাবার কথা ভাবতেও তাদের ভয় করে।

কামার মাইকেল ভ্লাশফ এদেরই একজন। দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক, গায়ে অসুরের মত শক্তি। গম্ভীর মুখ, ছোট ছোট চোখ, রুক্ষ ব্যবহার, মুখে সন্দেহের হাসি। ছুটির দিনে কোন না কোন মজুরের সঙ্গে সে মারামারি করবেই, লোহার ডাণ্ডা, পাথর, গাছের ডাল, যা পাবে তাই নিয়ে মারবে। সবাই তাই ওকে ভয় করে। ওর মুখে সর্বদাই একটা কথা—'নরকের কীট'।

কারখানার বড় সাহেব থেকে পুলিশের দারোগা পর্যন্ত সবাইকেই

সে বলে—পাজী বদমায়েস। বাড়ী গিয়ে বউকেও বলে—পাজী বদমায়েস।

মাইকেলের একমাত্র ছেলে পাভেল। পাভেলের বয়স যখন চৌদ্দ বছর তখন একদিন তার চুলের মুঠি ধরে মাইকেল তাকে মারতে গেল। পাভেল একটা হাতুড়ি তুলে নিয়ে রুখে দাঁড়ালো, বললো—গায়ে হাত দিও না বলছি!

মাইকেল তর্জন করে উঠলো—কী?

পাভেল জবাব দিল—আমি আর পড়ে পড়ে মার খাব না, অনেক মার খেয়েছি!

পাভেল হাতুড়িটা মাথার ওপরে ঘোরালো। মাইকেল তার পানে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো, তারপর বললো—ঠিক হ্যায়! পাজী বদ্‌মায়েস!

তারপর একদিন স্ত্রীকে ডেকে বললে—তোমার ছেলে বড় হয়েছে, এবার থেকে ওই তোমাকে খাওয়াবে। আমার কাছ থেকে আর কিছু চেও না।

—আর তুমি যা রোজগার করবে সব মদ খেয়ে ওড়াবে!—স্ত্রী বললো।

—বেশ করবো, তাতে তোর কি? পাজী বদ্‌মায়েস!

তারপর তিনটি বছর সে বেঁচে ছিল। ছেলের পানে ফিরেও আর তাকায়নি, একটা কথাও বলেনি তার সঙ্গে। তার অসুখ করলো, স্ত্রী ডাক্তার ডাকলো। ডাক্তার বললো—হাসপাতালে পাঠাতে হবে। ভ্লাশফ চীৎকার করে বললো—বেরোও পাজী বদ্‌মায়েস! আমি কোথাও যাব না, এইখানেই মরবো।

ভোরবেলা কারখানার ভোঁ বাজছে, তখন সে মারা গেল। অত্যন্ত যাতনা পেয়ে সে মরলো। বউ কাঁদলো। ছেলে কাঁদলো না।

সবাই বললো—মাইকেল মরলো, বউটার হাড় জুড়ালো।

একজন বললো—মরেনি, ওর জীবনটা পচে গেল।

কবর দিয়ে সকলে ঘরে ফিরে গেল। মাইকেলের কুকুরটা কিন্তু গেল না, কবরের ভিজে মাটির উপর বসে রইল অনেকক্ষণ।

দু' সপ্তাহ পরের কথা।

সেদিন রবিবার। পাভেল বাপের মতই মাতাল হয়ে টলতে টলতে বাড়ী ফিরলো, বাপের মতই টেবিলের উপর ঘুসি মেরে বললো—খাবার দাও!

মা তার পাশে গিয়ে বসলেন, তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। সে এক ধাক্কায় মাকে সরিয়ে দিল, বললো—শিগগির খাবার দাও, জল্‌দি!

মা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন।

পাভেল জড়িত কণ্ঠে বললো—বাবার পাইপটা দাও, তামাক খাব!

মায়ের চোখে করুণ দৃষ্টি ফুটে উঠলো, মা বললেন—এ কাজ কেন করলি বাবা?

পাভেল বমি করতে সুরু করলো, মা তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। ভিজা তোয়ালা দিয়ে তার কপাল ঢেকে দিলেন। পাভেল একটু সুস্থ হোল। মা বললেন—তুই মাতাল হলে বুড়ো মাকে কে দেখবে বল? আমাকে কে খাওয়াবে?

জড়িত কণ্ঠে পাভেল বললো—কেন, সবাই তো মদ খায়।

সত্যি সব মজুরই তো মদ খায়। তবু মা বললেন—তুই খাস নি বাবা, মদ খেয়ে তোর বাবা আমাকে সারা জীবন কষ্ট দিয়েছে।

পাভেলের মনে পড়লো বাপের কথা। বাপকে সে ভারী ভয় করতো, বাপের ভয়ে সে বাইরে বাইরে ঘুরতো। তেমন করে কোন দিন মায়ের মুখের পানে সে তাকায় নি, আজ ভালো করে দেখলো: সংসারের খাটুনি ও স্বামীর নির্যাতনে তাঁর দেহ ভেঙে পড়েছে, কপালে চিন্তার রেখা, চোখে বেদনা ও উদ্বেগ, সদাই যেন আঘাত পাবার ভয়! চলা ফেরা করেন নিঃশব্দে। মাথার কালো চুলের ফাঁকে সাদা সাদা আঘাতের চিহ্ন চোখে পড়ে।

পাভেল দেখলো মা কাঁদছেন। বললো—কেঁদো না মা, একটু জল দাও!

মা জল আনতে গেলেন, ফিরে এসে দেখেন পাভেল ঘুমুচ্ছে। গেলাসটি টেবিলের উপর রেখে, মা কাঁদতে কাঁদতে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন।

বাইরে তখন মজুরের দল মাতলামি করছে, গান গাইছে, হল্লা করছে।

আর পাঁচজন মজুর-ছেলের মতই পাভেলের দিন কাটে। সন্ধ্যা বেলা সেই নাচ গান আর মদ। আর সবাইকার মত পাভেলও কিনলো সার্ট, রঙীন নেকটাই, ছড়ি আর বেহালা। সে-ও আর সবাইকার মত বাবুগিরি করতে চায়, কিন্তু আনন্দ পায় না। মাকে এসে বললো—ওরা যেন এক একটা যন্ত্র, চলছে কিন্তু প্রাণ নেই।

পাভেল আড্ডায় যাওয়া ছেড়ে দিলে। বন্ধুরা ডেকে ডেকে ফিরে যায়। মা লক্ষ্য করেন ছেলের মুখ চোখে একটা নূতন ভাব। সে বই আনে, লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে, মাঝে মাঝে কাগজে কি সব নকল করে লুকিয়ে রাখে। অনেক রাত অবধি বসে বসে বই পড়ে। কথা-বার্তার ধরণ বদলে গেছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিয়েছে। মদ খায় না, কাউকে গালি দেয় না। মাঝে মাঝে শহরে যায়, কিন্তু মদ খেয়ে ফেরে না। মাইনে যা পায় মায়ের হাতে দেয়।

মা দেখেন, আর ভাবেন। তাঁর ভয় হয়।

এই ভাবেই ধীরে ধীরে দুটি বছর কেটে গেল।

একদিন রাত্রে খাবার পর পাভেল বই পড়েতে বসেছে, এমন সময় মা এসে দাঁড়ালেন কাছে। বললেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুই দিনরাত কি এত পড়িস্?

পাভেল বললো—যে বই পড়া বারণ, সেই সব বই আমি পড়ছি। এই সব বইয়ে মজুরদের সম্পর্কে সত্যি কথা লেখা আছে। সেইজন্য

এই সব বই লুকিয়ে ছাপা হয়, পুলিশ জানতে পারলেই আমাকে ধরবে, আমার জেল হবে।

মা বললেন—কেন এসব পড়িস্?

—সত্যি কথা জানতে চাই!—পাভেল বললো।

মার অন্তর কেঁপে উঠলো, চোখে দেখা দিল জল।

পাভেল বললো—কেঁদো না মা। তোমার জীবনটাই ভেবে দেখ দেখি! তোমার আজ চল্লিশ বছর বয়স হয়েছে কিন্তু একটা দিনও কি তোমার সুখে কেটেছে? বাবা তোমাকে মারতেন। কেন জান? বাবার জীবন ছিল বড় দুঃখের, সেই ঝাল তিনি ঝাড়তেন তোমার উপর। কিন্তু তিনি জানতেন না, তাঁর দুঃখের কারণ কি। কারখানায় তিনি খেটেছেন ত্রিশ বছর। প্রথম যেদিন এসে তিনি কারখানায় ঢোকেন সেদিন কারখানার বাড়ী ছিল মাত্র দুটি, এখন সেখানে বাড়ী উঠেছে সাতটা। কিন্তু বাবা ত্রিশ বছর খেটে কি পেয়েছেন? কারখানার উন্নতি হয়েছে, কিন্তু মানুষ মরে গেছে। এই হয়,—কারখানা বাড়ে, আর তারই চাকায় তেল জোগাতে মানুষ মরে।

মা ছেলের মুখে আজ নূতন কথা শুনলেন। বললেন—তা তুই কি করতে চাস্?

—বই পড়তে হবে, পড়ে অন্যকে শিক্ষা দিতে হবে। মজুরদের বই পড়া দরকার, তাদের জানতে হবে—জীবন কেন এত কঠোর।

—তা তুই কি পারবি এই সব করতে?

—হ্যাঁ পারবো!

তারপর পাভেল বললো সেই সব মানুষের কথা, যারা মানুষের কল্যাণ চায়, আর সেই কল্যাণ চাওয়ার জন্যই আরেকদল লোকের কাছে তারা অপরাধী, এই লোকগুলি তাদের মারে, জেলে দেয়, এরা সয়তান।

মা শোনেন, শুনতে শুনতে ভয়ে কেঁপে উঠেন, বলেন—তুই সাবধানে থাকিস বাবা। এখানকার লোকেরা কেউ ভাল নয়, এরা

পরের ক্ষতি করে খুসি হয়, অন্যকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায়, তুই ওদের ভালো করতে গেলে, ওরা তোর সর্বনাশ করবে।

পাভেল বললো—তা জানি। আমি ছেলেবেলায় শিখেছিলাম এদের ভয় করতে, বড় হয়ে শিখেছি এদের ঘৃণা করতে। কিন্তু আজ আমি এদের দেখছি নূতন চোখে, আজ এদের জন্য আমার দুঃখ হয়। এখন আমার মনে হয় এই নীচতা এই ক্ষুদ্রতার জন্য এরা নিজেরা দায়ী নয়।

মা চুপ করে শোনেন, তাঁর মনে জাগে আনন্দ আর ভয়।

পাভেল একদিন বললো—মা, শনিবার এখানে কয়েকজন লোক আসবে।

—কারা ?

—এখানকার ক'জন আর শহরের ক'জন।

মায়ের চোখে জল এসে পড়লো, মা চোখ মুছলেন।

পাভেল বললো- ভয় পাচ্ছ ?

মা বললেন—কি জানি বাবা, শহরের লোক কেমন হবে।

পাভেল বললো—এই ভয়ই তো আমাদের সর্বনাশ করে, আমরা ভয় পাই বলে ওরা আমাদের আরও ভয় দেখায়। যতদিন আমরা ভয় করবো, ততদিন আমরা পচে মরবো। চাই সাহস।

মা বললেন—তবু আমার ভয় করে।

পাভেল বললো—কিন্তু তারা আসবেই। আমি যা ঠিক করেছি তা বদলাবে না।

শনিবার দিন রাত্রে তারা এলো। তারা আসার আগে পাভেল বললো—মা, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, এখনই ফিরবো, ওরা এলে বসিও!

মা একা বসে রইলেন। বাইরে তখন ঘন অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে শিষ দিতে দিতে কে যেন এলো, পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজা ঠেলে ভিতরে এসে ঢুকলো একটা রোগা মানুষ, হাত তুলে বললো—নমস্কার।

মা বললেন—পাভেল এখনই ফিরবে, বসো।

লোকটি চামড়ার কোট থেকে তুষার ঝেড়ে ফেলে, টেবিলের উপরেই চেপে বসলো। তারপর সুরু করলো মায়ের সঙ্গে ঘর-সংসারের কথা, বললো—মা, তোমার কপালে ওই দাগটা কিসের ?

কথাটা মায়ের ভাল লাগলো না, বললেন—তাতে তোমার কি দরকার ?

—রাগ কর না, মা। আমার মায়ের কপালেও ঐ রকম একটা দাগ ছিল। আমার বাবা ছিলেন মুচি আর মা ছিলেন ধোপার মেয়ে। বাবা তাঁকে কি মারই মারতেন, মার খেয়ে মায়ের কপাল কেটে গিয়েছিল। বাবা মাকে মারতেন আর রাগে আমার শরীর ফুলতো।

মায়ের রাগ পড়ে গেল, ভাবলেন—ছেলেটি তো বেশ !

লোকটির নাম আঁদ্রে।

তারপর এলো একটি মেয়ে, নাম নাটাশা। মুখখানি সুন্দর, স্বাস্থ্য ভাল, মাথাভরা চুল। তার মুখের পানে তাকিয়ে মায়ের নিজের মৃতা মেয়েটির কথা মনে পড়লো।

তারপর এলো পাকা চোর বুড়ো দানিয়েলের ছেলে নেকোলাই। আঁদ্রে ও নাটাশার পানে তাকিয়ে বললো—নমস্কার বন্ধু !

মা তো অবাক !

তারপর এলো কারখানার চৌকিদার শামোভের ছেলে।

সবার শেষে এলো পাভেল, কারখানার দু'জন মজুরকে সঙ্গে নিয়ে।

ঘরের মধ্যে সভা বসলো। এক কোণে আলোর নীচে বসলো নাটাশা, আর সবাই বসলো টেবিলের চারিপাশে। নাটাশা একখানি বই পড়ে শোনাতে সুরু করলো—লোকে এমন হীনভাবে জীবন যাপন করে কেন তা বুঝতে হলে জানা দরকার সেই প্রাচীন কালে মানুষ কি ভাবে জীবন-যাত্রা সুরু করেছিল।...

নিকোলাই বলে উঠলো—মানুষ কিভাবে জীবন কাটাতো তা

জানতে চাই না, মানুষের কিভাবে জীবন কাটানো উচিত তাই জানতে চাই।

ইয়াকোভ বললো—সামনে এগোতে হলে পিছনের কথাও জানতে হবে।

নাটাশা বললো—সব কিছুই আমাদের জানতে হবে।

পাভেল বললো—আমরা মানুষের মত মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই। আমরা দেখাবো মজুর হলেও আমাদের বুদ্ধি মালিকদের চেয়েও কম নয়। আমাদের শক্তি তাদের চেয়ে অনেক বেশী।

আঁদ্রে বললো—এই পচা জীবন পার হয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে কল্যাণময় ভবিষ্যতের দিকে।

এমনি ভাবে এলোমেলো আলোচনা চললো।

সভা ভাঙলো রাত দুপুরে। সকলে চলে গেল। মা জিজ্ঞাসা করলেন—ওই মেয়েটি কে রে?

পাভেল বললো—একজন শিক্ষিকা।

—এই শীতে ওর গায় গরম পোষাক নেই, ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে যে? ওর আপনার লোক কেউ নেই বুঝি? খুব গরীব, না?

—মস্কো সহরে ওর বাবার মস্ত বড় লোহার কারবার। আমাদের দলে যোগ নিয়েছে বলে ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ওকে এখন এই ঠাণ্ডায় চার মাইল পথ হেঁটে যেতে হবে।

—এতো রাত্তিরে যাবার কি দরকার ছিল, ও তো এখানে আজ থাকতে পারতো?

—তা পারতো, কিন্তু কাল সকালে কেউ ওকে এখানে দেখতে পেলেই তো বিপদ হবে।

—কিন্তু আমি তো কিছু অন্যায় দেখছি না, তোরা তো খারাপ কাজ কিছু করছিস না।

—আমরা অন্যায় কিছু করি না, তবুও আমাদের জন্য জেলের দরজা খোলাই আছে।

মায়ের বুক কেঁপে উঠলো, বললেন—ভগবান তোদের রক্ষা করুন।

পাভেল বললো—ভগবান আমাদের রক্ষা করতে পারবে না, মা। জেল আমাদের হবেই।

মা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। অন্ধকার রাত, তুষার পড়ছে, ঝড়ো বাতাসের হুঙ্কার। প্রাণহীন গাছগুলি শন্ শন্ করছে। বহুদূরে দেখা যাচ্ছে শহরের ক্ষীণ আলো। মা ভগবানের কাছে কাতর ভাবে প্রার্থনা জানালেন—ভগবান, তুমি রক্ষা কর।

সেই থেকে প্রতি শনিবারেই পাভেলের বাড়ীতে দলের বৈঠক বসে। পাভেলের ছোট ঘরখানি লোকে ভরে ওঠে।

নাটাশা আসে। এই মেয়েটিকে মায়ের বড় ভাল লাগে। মা তার জন্য একজোড়া মোজা বুনেছেন। একদিন তা পরিয়ে দিলেন নাটাশার পায়ে। নাটাশা বললো—আমার এক ধাইমা ছিল, সে-ও আমাকে এমনি ভালবাসতো।

মা বললেন—তুমি আপনার জনদের ছেড়ে এত দুঃখ-কষ্টের মাঝে কেন এসেছ?

—আমার শুধু মা'র জন্য কষ্ট হয়, তাঁকে দেখতে ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে।

মা নাটাশার মুখের পানে তাকিয়ে ভাবেন—মেয়েটি বেশ, আমার ছেলের যদি বউ হোত!

মাঝে মাঝে নাটাশা আসে না। শহর থেকে আসে আরেকটি মেয়ে শশেংকা। গম্ভীর মুখ, গলার স্বরটা কেমন যেন রুক্ষ। একটা তেজ আছে তার মধ্যে। কথায় কথায় একদিন সে মাকে বললো—আমরা সোস্যালিস্ট।

'সোস্যালিস্ট' কথাটা মা ছেলেবেলায় শুনেছিলেন। সোস্যালিস্টরা নাকি জারের শত্রু। জার চাষীদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন

বলে তারা শপথ করেছিল যে, জারকে খুন না করে তারা চুল ছাঁটবে না। জারকে তারা খুনও করেছিল।

মা পাভেলকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই সোস্যালিস্ট ?

—হ্যাঁ, কেন বলত ?

—তোরা জারকে খুন করবি ?

পাভেল হেসে বললো—আমরা কাউকে খুন করবো না।

তারপর মাকে বুঝিয়ে দিল তাদের কাজ আর উদ্দেশ্য।

এবার দলের বৈঠক বসতে লাগলো সপ্তাহে দু'দিন করে।

আলোচনা শুনতে শুনতে মায়ের মনও সচেতন হয়ে উঠতে লাগলো।

একদিন মা আঁদ্রেকে বললেন—তোমরা খুব মজার লোক। তোমাদের কাছে স্বদেশ-বিদেশ বলে কিছু নেই, ইহুদী অস্ট্রীয়ান আর্মানিয়ান সবাই তোমাদের বন্ধু, সবার দুঃখে তোমরা দুঃখী।

আঁদ্রে বললো—আমাদের কোন জাতি নেই। সারা দুনিয়ার মজুর আমাদের বন্ধু। ধনিকেরা আমাদের শত্রু। এই দুনিয়া মজুরদের। মজুররাই সংখ্যায় বেশী, বিরাট তাদের শক্তি। সারা দুনিয়ার যেখানে যে-ই থাকি, সবাই আমরা এক, আমরা সবাই ভাই।

মা ভাবেন—সত্যি কথা, মজুরদের শক্তি বিরাট।

আঁদ্রেকে মায়ের খুব ভাল লাগে, মনে হয় সে-ও যেন তাঁর আর এক ছেলে। একদিন পাভেলকে বললেন—আঁদ্রে এখানেই থাক, ওকে বড় ছোটাছুটি করতে হয়।

পাভেল বললো—বেশ থাক্।

আঁদ্রে পাভেলদের বাড়ীতেই থেকে গেল।

নিকোলাই একদিন এসে খবর দিল—আমাদের নিয়ে সকলে কানাঘুষা করছে। এই বেলা গা ঢাকা দাও।

আঁদ্রে বললো—এতো ভয় কিসের ?

সত্যই পাভেলের বাড়ীটা পল্লীর আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সরাইখানার বুড়ো মালিক একদিন মাকে বললে—তোমার ছেলের খবর কি ? ও আর হোটেলে আসে না, গির্জাতেও যায় না, পার্বণেও যোগ দেয় না, এক জায়গায় বসে শুধু ঘোঁট পাকায়। এ সব কি হচ্ছে ? এতো গোপন পরামর্শ কিসের ?

তারপর একদিন প্রতিবেশী কামার-গিন্নী বললো—বলি, ছেলেকে সাবধান করে রেখো।

মা বাড়ী এসে ছেলেদের বললেন—সবাই তোদের নিন্দে করছে। তোরা আর মদ খেতে যাস্ না, বিয়েও করছিস্ না, এদিকে বাইরে থেকে সব মেয়েরা আসছে এখানে। পাড়ার মেয়েরাও তোদের উপর বিরূপ হয়ে আছে।

আঁদ্রে বললো—মেয়েগুলো কি বোঝে না, বিয়ে করলে তাদের অবস্থা কি হবে। এতো দুঃখ কষ্ট, এর উপর যদি বিয়ে করে ছেলেপুলে হয়, তাহলে যে পাচে মরবে।

মা বললেন—তা তো তারা চোখের উপরেই দেখছে, তবু আর কি করার আছে বল ?

পাভেল বললো—তাদের বুদ্ধি থাকলে তারা জীবিকা অর্জনের পথ করে নিত।

মা বললেন—তোরা তাদের বুঝিয়ে দে না ?

পাভেল বললো—তারা কিছুতেই বুঝবে না।

আঁদ্রে বললো—বেশ তো, চেষ্টা করেই দেখা যাক্ না।

পাভেল বললো—আর চেষ্টা করে দরকার নেই। চেষ্টা করতে গিয়ে তুমিই হয়তো একদিন বিয়ে করে বসবে। তাতে আমাদের কাজ কতখানি এগোবে ?

মা বুঝলেন ছেলেরা বিয়ে করতে চায় না। তাঁর দুঃখ হোল, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন শুধু।

পরদিন মজুর পল্লীতে উত্তেজনা দেখা দিল।

সমাজতন্ত্রীরা মজুরদের মধ্যে 'লাল ইস্তাহার' বিলি করে গেল। সেই ইস্তাহারে লেখা ছিল—মজুরদের সত্যিকারের অবস্থার কথা, মালিকের সঙ্গে লড়ায়ের কথা, ধর্মঘটের কথা, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে মজুরদের দাবী আদায়ের আহ্বান।

ইস্তাহার পড়ে মজুরদের মধ্যে স্থুরু হয়ে গেল আলোচনা। যারা বেশী মাহিনা পায় তারা বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠলো, উপরওয়ালাদের নিয়ে গিয়ে দেখালো ইস্তাহারগুলি। কম বয়সী তরুণের দল চঞ্চল হয়ে উঠলো। আর সাধারণ মজুরেরা বললো—এ সব তো হুজুগ, এতে কিছুই হবে না।

কিন্তু চঞ্চল হয়ে উঠলো সকলেই।

সেদিন থেকে প্রতি সপ্তাহেই লাল ইস্তাহার দেখা দিতে লাগলো।

মা জানতেন এই ইস্তাহার তাঁর ছেলেরই কীর্তি। তাঁর গর্ব হোত, কিন্তু ভয়ও কম হোত না।

প্রতিবেশী কামার-গিন্নী একদিন বললো—সেদিন সাবধান করে দিয়েছিলাম,আজ টের পাবে। আজ পুলিশ আসবে। বুঝবে এবার ঠেলা!

মায়ের হাত পা অবশ হয়ে এলো, তিনি সেইখানেই বসে পড়লেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল, তাঁর ছেলের বিপদ। ছুটলেন বাড়ীর দিকে।

কারখানার ছুটি হলে পাভেল ও আঁদ্রে বাড়ী ফিরলো।

মা রান্নাঘরের বেঞ্চিতে বসে ছিলেন, বললেন—শুনেছিস্?

পাভেল বললো—হ্যাঁ। তোমার ভয় করছে ত?

আঁদ্রে বললো—ভয় করে লাভ কি? ভয় করলেই কি বিপদ থেকে বাঁচতে পারবে?

পাভেল খানকয়েক বই বেছে নিয়ে বাইরে এক জায়গায় রেখে এলো।

আঁদ্রে মাকে সাহস দিয়ে বললে—ভয় নেই মা। ওরা একেবারে

অপদার্থ, বাড়ী এসে তল্লাস করলে পাবে কি? কিছুই না। শেষকালে বীরদর্পে রাস্তা কাঁপিয়ে চলে যাবে। আগে ওরা একবার আমার উপর চড়াও হয়েছিল, আমার ঘরের জিনিষ-পত্র সব তচনচ করে আমাকে গ্রেপ্তার করলো। জেলে আটকে রাখলো চারমাস। জেলখানায় কাজকর্ম কিছুই ছিল না, খালি কুঁড়ের মত বসে থাকা। আর ওরা করবেই বা কি? সরকারের মাইনে খায়, একটা কিছু না করলে চাকরী থাকবে কেন?

মা শোনেন, সান্ত্বনা পান।

কিন্তু পুলিশ সে রাত্রে এলো না, এলো ঠিক একমাস পরে। হঠাৎ। রাত তখন দুপুর। পাভেল, আঁদ্রে ও নিকোলাই গল্প করছিল, মা শুয়ে পড়েছিলেন, এমন সময়—পুলিশ দরজায় ধাক্কা দিল।

মা কাঁপতে কাঁপতে বিছানার উপর উঠে বসলেন।

পাভেল বললো—উঠো না, শুয়ে থাক। তোমার অসুখ।

দারোগা এসে ঘরে ঢুকলো। সঙ্গে চৌকিদার ফিদিয়াকিন।

ফিদিয়াকিন দেখিয়ে দিল—এই পাভেল আর ওই ওর মা।

দারোগা বাজখাঁই গলায় জিজ্ঞাসা করলো—তুমি পাভেল ভ্লাসব?

—হ্যাঁ।

—তোমার বাড়ী খানাতল্লাশ করবো।

—বেশ।

পুলিশ খানাতল্লাশী সুরু করলো। জিনিষ-পত্র ফেললো, ছুঁড়লো, ভাঙলো, তচনচ করে দিল। তারপর মাকে বললো—এই বুড়ী ওঠ্!

পাভেল বললো—ওঁর অসুখ।

—তুমি থামো! এই বুড়ী!

দারোগা বইগুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছিল, নিকোলাই সইতে পারলো না, বললো—বইগুলো অমন করে ছুঁড়ে ফেলার দরকার কি?

দারোগা কট্মট্ করে তার দিকে তাকালো।

মা ভয় পেলেন, তাড়াতাড়ি পাভেলকে বললেন—নিকোলাইকে কথা বলতে বারণ কর।

দারোগা ধমক দিল—চুপ কর! কি কথা বলছ? এ বাইবেল পড়ে কে?

পাভেল বললো—আমি।

—এ বইগুলো কার?

—আমার।

—হুম্!

নিকোলাইয়ের দিকে তাকিয়ে দারোগা জিজ্ঞাসা করলো—তুমিই আঁদ্রে নাখোদ্‌কা?

নিকোলাই বললো—হ্যাঁ।

আঁদ্রে এগিয়ে এসে বললো—আমার নাম আঁদ্রে নাখোদ্‌কা।

দারোগা চোখ রাঙিয়ে দু'জনের পানে তাকিয়ে বললো—সাবধান!

তারপর পকেট থেকে কাগজপত্র বের করে বললে—আঁদ্রে, এর আগেও রাজনৈতিক অপরাধে তোমাকে ধরা হয়েছিল? তোমার ঘর খানাতল্লাশী হয়েছিল?

—হ্যাঁ, রস্টোভ আর সারাটোভে। কিন্তু সেখানকার পুলিশ ছিল ভদ্র, তারা আমার নামের আগে 'মিস্টার' বলতো।

দারোগা দাঁত খিঁচিয়ে বললো—মিস্টার আঁদ্রে, বলতে পার কোন্ বদমায়েসরা বে-আইনী 'লাল ইস্তাহার' বিলি করে?

নিকোলাই জবাব দিলে, বললে—বদমায়েস তো এই এখানেই প্রথম দেখছি।

দারোগা ক্ষেপে উঠল, বললো—এই কুকুরটাকে এখান থেকে নিয়ে যাও।

দু'জন পুলিশ নিকোলাইকে ধরে বাইরে নিয়ে গেল।

খানাতল্লাশী করে দারোগা বললো—মিস্টার আঁদ্রে নাখোদ্‌কা, তোমাকে গ্রেপ্তার করা হোল।

—অপরাধ কি?

—পরে জানতে পারবে। এই বুড়ী, লিখতে পড়তে জানিস্ ?

পাভেল বললো—না।

—তুমি চুপ কর। এই বুড়ী!

মা আর সইতে পারলেন না, বললেন—কেন তোমরা মানুষকে এমন করে কষ্ট দাও ?

—চুপ কর! বাজে বকো না। এই, সেই শূয়োরটাকে নিয়ে আয়।

দু'জন পুলিশ নিকোলাইকে ভিতরে নিয়ে এলো।

দারোগা বললো—এই, মাথা থেকে টুপি নামা।

নিকোলাই বললো—হুজুর, দু'খানা হাতই বাঁধা আছে, আমার তো তৃতীয় হাত নেই, আপনার হুকুম তামিল করবো কি করে ?

দারোগা অপ্রস্তুত হোল।

দারোগা নিকোলাই ও আঁদ্রেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

পাভেল বললো—দুঃখ করো না মা, তৈরী হও। তোমাকে অনেক সইতে হবে।

পরদিন খবর ছড়িয়ে পড়লো যে সেই রাত্রে পুলিশ আরো কয়েক জায়গায় হানা দিয়েছে ও আরো ছ'জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

প্রতিবেশী বৃদ্ধ রিবিন সেদিন পাভেলের বাড়ী এলো। চমৎকার মানুষ, বললো—তোমরা খারাপ কিছুই কর না, তবু লোকে তোমাদের খারাপ বলে। তোমরা গির্জায় যাও না। ধর্মের নামে ওই সব ভণ্ডামি আমারও ভাল লাগে না। তোমাদেরকে আমার ভাল লাগে। এই সব লাল ইস্তাহার কি তোমরাই বের কর ?

পাভেল বললো—হ্যাঁ।

বৃদ্ধ বললো—বেশ লেখা। চিন্তাশীল লেখা। সব শুদ্ধ বারোটা বেরিয়েছে, না ?

—হ্যাঁ।

—সবগুলোই আমি পড়েছি।

তারপর দু'জনে সুরু হয় আলোচনা। রিবিন বললো—দেখ, বয়সে কিছু আসে যায় না, ঠিকমত চিন্তা করাটাই হচ্ছে আসল কথা। ভগবানের নাম নিয়ে ওরা কি না করছে, সত্যকে ঢেকে দিয়েছে। আমাদের ধর্ম মিথ্যা, ধর্মই আমাদের ক্ষতি করছে।

মা ব্যথা পেলেন, বললেন—ধর্মের নামে তোমরা এসব কি বলছ ? এতে তো তোমাদের মঙ্গল হবে না।

পাভেল বললো—মা, তুমি যে ভগবানের পূজা কর তার কথা আমরা বলছি না। যে ভগবানের নামে ওরা আমাদের ঠকাচ্ছে, নিজের সুবিধামত কাজে লাগাচ্ছে, সেই ভগবানের কথাই আমরা বলছি।

রিবিন বললো—এই ভগবানকে বদলে ফেলতে হবে, তাহলেই ভবিষ্যতে ভাল হবে।

আরো অনেক কথা বলে রিবিন চলে গেল।

মা বসে বসে তাদের সব কথা শুনলেন।

তারপরেও রিবিন আরো কয়েক দিন এলো। মা বসে বসে তাদের আলোচনা শুনতেন, কত কথা শিখতেন।

পাভেল মজুরদের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠলো। কার উপর কর্তারা কোন অত্যাচার অবিচার করলেই সে ছুটে আসে পাভেলের কাছে।

সেবার একটা জলা জায়গা নিয়ে বাধলো গোলমাল। কারখানার পিছনে একটা জলা জায়গা ছিল, ম্যানেজার স্থির করলেন—এই জায়গাটা পরিষ্কার করতে পারলে কারখানার কাজে লাগবে, পরিষ্কার করার সময় এখানকার আবর্জনা থেকে যথেষ্ট পিচ্ তৈরী করা চলবে। তিনি কারখানার মজুরদের কাছে ঘোষণা করলেন—ওই জলাভূমি থেকে পচা জলের গন্ধ বেরোয়, মশা জন্মায়, মজুররা প্রায়ই ম্যালেরিয়ায় ভোগে। জায়গাটা সাফ করলে মজুরদের স্বাস্থ্য ভাল হয়। মজুরদের যখন স্বাস্থ্য ভাল হবে তখন সাফ করানোর খরচটা মজুররাই দেবে। মজুররা প্রত্যেকে মাইনে থেকে প্রতি রুবল পিছু এক কোপেক করে দেবে।

মজুরেরা প্রতিবাদ করলো।

পাভেল অসুস্থ ছিল, কারখানায় যায়নি, ছ'জন এসে তাকে খবর দিলে—সবাই বলছে, জলা সাফ করার খরচ আমরা কেন দোব? তিন বছর আগে আমাদের স্নানের ঘর তৈরী করার জন্য তিন হাজার আট শো রুবল আদায় করেছিল, সে টাকা কোথায় গেল?

পাভেল বললো—এ টাকাও ওদের পকেটেই যাবে। এটা ওদের জুলুম। তোমরা গিয়ে ওদের বলগে—

পাভেল কাগজ পেনসিল নিয়ে লিখতে বসলো। লেখা শেষ করে বললো—মা, এই কাগজখানা শহরে গিয়ে আমাদের দলের লোকের কাছে দিয়ে আসতে হবে। পরের সংখ্যায় আমাদের কাগজে এই খবরটা বেরুনো চাই-ই; খুব সাবধানে নিয়ে যাবে।

মা কাগজখানি নিয়ে চলে গেলেন।

দু-একদিনের মধ্যেই তার ফল দেখা গেল।

তখনও পাভেলের অসুখ সারেনি, সে কারখানায় যায় নি। দুপুর বেলা ফিড়িয়া ছুটে এলো, বললো—কারখানায় হুলুস্থুল পড়ে গেছে।

মজুরেরা কেউ কাজ করতে যায়নি, তুমি চল, সবাই তোমাকে ডাকছে।

মা বললেন—ওর অসুখ করেছে, আমিও তাহলে সঙ্গে যাই।

পাভেল কারখানায় গিয়ে দেখলো—মজুরদের ভীড়, ফটকে মেয়েরা চীৎকার করছে। ভিতরের প্রাঙ্গণে মজুরদের সভা বসেছে, রিবিন দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছে। পাভেল যেতেই সাড়া উঠলো—চুপ, চুপ! ওই পাভেল এসেছে।

সবাই চুপ করলো। পাভেল সভার মাঝে দাঁড়িয়ে বলতে সুরু করলো—ভাইসব! দুনিয়ায় যা কিছু নিত্যকার দরকার—গির্জা কারখানা, রাস্তা, সেতু, কাপড়, ওষুধ—এ সব কারা চিরদিন তৈরী করে আসছে? আমরা—মজুরেরা। কিন্তু আমাদের কথা কে ভাবে? কে আমাদের মানুষ বলে মনে করে?—কেউ না। বন্ধুগণ, মুনাফাখোর মালিকদের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়ার দিন এসেছে। আমাদেরকেই আমাদের রক্ষা করতে হবে। ম্যানেজারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, তার কি বলার আছে শুনতে হবে।

সবাই সাড়া তুললো—ডাকো ম্যানেজারকে, বলুক তার কি বলার আছে।

কে যাবে ম্যানেজারকে ডাকতে? প্রতিনিধি নির্বাচন হলো—রিবিন, পাভেল, ও সিজভ। কিন্তু তারা ম্যানেজারের কাছে যাবার আগেই ডিরেকটার নিজেই এলো। কাউকে না ছুঁয়ে ভীড়ের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। বললো—এ ভীড়ের মানে কি?

সবাই চুপ।

ডিরেকটার লম্বা চওড়া জোয়ান, ভ্রূ কুঁচকে কাউকে গ্রাহ্য না করে বললো—তোমরা কাজ ফেলে এখানে হল্লা করছ কেন? বল?

কেউ উত্তর দিল না।

ডিরেকটার বললো—উত্তর দাও কেন হল্লা করছ?

এবার পাভেল এগিয়ে এলো, বললো—মজুরেরা আমাদের তিন-

জনকে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেছে, আপনার কাছে গিয়ে চাঁদার হুকুমটা বাতিল করার জন্য বলতে।

ডিরেকটার বললো—কেন?

পাভেল বললো—এ রকম ভাবে চাঁদা আদায় করা অন্যায়।

—বটে! তোমরা মনে করছ ওটা টাকা আদায়ের ফন্দি? তোমাদের ঠকানো হচ্ছে?

—ঠিক তাই।

—ওর মধ্যে তোমাদের ভাল করার ইচ্ছা নেই কি?

—আমাদের ভাল করার ইচ্ছা থাকলে, মালিকেরা নিজের খরচেই কাজটা করতো।

—কারখানাটা কি দানছত্র? ওসব চলবে না। সবাই কাজ করগে। পনেরো মিনিটের মধ্যে কাজে না গেলে সবাইকে আমি বরখাস্ত করবো।

ডিরেকটার সদর্পে চলে গেল!

স্থরু হোল গোলমাল।

একজন বললো—ফ্যাঁসাদে পড়া গেল!

আরেক জন পাভেলকে বললো—কি হে মাতব্বর, এবার ঠেলা সামলাও!

পাভেল বললো—ভাইসব, আমি প্রস্তাব করছি যে কোপেক্ ট্যাক্স্ রদ না হওয়া পর্যন্ত আমরা ধর্মঘট করবো।

—আমরা আহাম্মক কি না?

—এ ছাড়া ওদের কাবু করা যাবে না।

—এক কোপেকের জন্য সকলের কাজ যাবে?

—কাজ যাবে কেন? আমরা ছাড়া কাজ করবে কে?

—কত লোক আছে! নতুন লোক নিয়ে আসবে।

—তার চেয়ে টাকাটা দেওয়াই ভাল।

পাভেল মায়ের পাশে এসে দাঁড়ালো।

রিবিন বললো—এদের নিয়ে তুমি লড়াই জিতবে? এরা

করবে ধর্মঘট? যত ভীরু আর লোভী, এরা করবে ন্যায়ের লড়াই?

পাভেল একটি কথাও বলতে পারলো না। যে বিশ্বাস নিয়ে সে দাঁড়িয়ে ছিল, তা নষ্ট হয়ে গেল। সে আর দাঁড়ালো না, বাড়ী চললো মায়ের সঙ্গে।

মজুররাও কাজে গিয়ে যোগ দিল।

সেই রাত্রেই পুলিশ পাভেলকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। যাবার সময় মা আশীর্বাদ করলেন—ভগবান তোর সঙ্গে রইলেন।

পরদিন। শূন্য গৃহে মায়ের মন হু হু করছে, না জানি পাভেলকে তারা কত কষ্ট দিচ্ছে।

রিবিন এলো, বললো—কাল রাত্রে পুলিশ আমার বাড়ীতেও হানা দিয়েছিল, কিন্তু আমায় ধরলো না ধরলো পাভেলকে। ডিরেকটর গিয়ে বললো আর পুলিশ পাভেলকে ধরলো—চোরে চোরে মাসতুতো ভাই!

মা বললেন—পাভেলের জন্য সকলের লড়া উচিত।

রিবিন হাসলো, বললো—লড়বে কে? মালিকেরা শত শত বছর ধরে শক্তি সঞ্চয় করেছে, ইচ্ছা করলেই কি তাদের সঙ্গে লড়া যায়!

রাত্রে এলো সামোলোভ ও ইগর আইভানোভিচ। ইগর বললো—জানো মা, নিকোলাই জেল থেকে বেরিয়েছে।

—তাই নাকি? কতদিন সে জেলে ছিল?

—পাঁচ মাস এগারো দিন।

—যে রাত্রে তাকে ধরে নিয়ে গেল, সেই রাত্রের কথা আমার মনে পড়ছে।

—নিকোলাইয়ের সঙ্গে পাভেল ও আঁদ্রের দেখা হয়েছিল। পাভেল বলেছে যে তুমি ভয় পেও না, আর আঁদ্রে তোমাকে নমস্কার

পাঠিয়েছে। জেলখানা হোল আমাদের একটা বিশ্রামের জায়গা, ওতে ভয় পাবার কিছু নেই। কাল কতজনকে ধরেছে জানো মা—আটচল্লিশ জনকে।

—বল কি!

—আরও জনা দশেককে ধরবে। তার মধ্যে এই সামোলোভ-ও একজন।

মায়ের মনটা একটু হাল্কা হোল। তাঁর ছেলে তাহলে একা নয়। বললেন—তবে তোমাদের বেশীদিন আটকে রাখতে পারবে না।

ইগর বললো—ঠিক কথা। এখন একটা কাজের কথা শোন। নেই লাল ইস্তাহারগুলো যদি আর কারখানায় না যায় তাহলে পুলিশ কর্তারা ভাববে ওগুলো পাভেলই লিখতো—ছাপাতো—ছড়াতো, ওদের ধরবার পরেই সব বন্ধ হয়ে গেল। তাহলে পাভেলকে ওরা আর ছাড়বে না। আমাদের এখন কাজ হচ্ছে ইস্তাহারগুলো আগের মতই কারখানায় ছড়ানো। কিন্তু মুস্কিল হোল যে, সেগুলি কারখানার ভিতরে নিয়ে যাবে কে? আজকাল ফটকে বড় কড়াকড়ি, যে ভিতরে ঢোকে তাকেই সার্চ করে দেখে।

মা বললেন—তা আমাকে কি করতে হবে বল?

—মেরীয়ানা তো রোজ খাবার ফিরি করতে যায়, ওকে দিয়ে ইস্তাহারগুলো পাঠাতে পারা যায় না? আমরা পয়সা দোব।

—তবেই হয়েছে। তাহলে গাঁ শুদ্ধ লোক কেউ জানতে বাকি থাকবে না।

—তাহলে কি করা যায়?

—আমি নিজেই একাজ করবো। আমিই যাব খাবারের ফেরিওয়ালী হয়ে।

—তাহলে তো খুব ভালই হয়।

দু'জনে যাবার সময় বলে গেল—কালই তাহলে ইস্তাহারগুলো পাঠাবো, মা।

পরদিন কারখানায় দেখা দিল খাবারের নূতন ফেরিওয়ালী। মা

বললেন—ফেরিওয়ালা বাজারে গেছে ফিরি করতে, তার বদলে পাঠিয়েছে আমাকে।

টিফিনের সময় মাকে মজুররা ঘিরে ধরলো। নানা জনে নানা কথা বললো। কেউ কেউ তাকে সান্ত্বনা দিল, আবার একজন বললো—আমি যদি দেশের শাসনকর্তা হতাম তাহলে তোমার ছেলের ফাঁসী দিতাম আর যাতে সে কোন লোককে বিগড়াতে না পারে।

সে কথা শুনে মায়ের বুক কেঁপে উঠলো।

সেদিন পুলিশ কারখানায় এসেছিল। মা দেখলেন তারা সামো-লোভকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশের পিছনে চলেছে শ'খানেক মজুর, তারা টিট্‌কারি দিচ্ছে পুলিশকে।

একজন সামোলোভকে বললো—কি বন্ধু, হাওয়া খেতে যাচ্ছ?

আরেক জন বললো—কি খাতির দেখ, সঙ্গে দু'জন দেহরক্ষী চলেছে।

আর সকলে হেসে উঠলো, শিষ দিল।

একজন বললো—কি আর করবে, চোর ডাকাত ধরে মজুরী পোষাচ্ছে না, এখন ভালমানুষ ধরছে!

পুলিশ জোর জোর পা চালাচ্ছিল, যেন এদের কথাগুলো তারা এড়িয়ে চলতে চায়।

মা দেখলেন সামোলোভ হাসিমুখে চলেছে পুলিশের সঙ্গে। দুঃখে তাঁর মন ভরে গেল।

সন্ধ্যাবেলা মা বসে ভাবছেন কখন্ আইভানোভিচ্ এসে ইস্তাহারগুলি দিয়ে যাবে। এমন সময় দরজায় টোকা মারার শব্দ হোল। মা তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিলেন। আইভানোভিচ্ আসেনি, এসেছে শশেংকা। শশেংকা আগের চেয়ে অনেক মোটা হয়েছে দেখে মা জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি, এতদিন কোথায় ছিলে?

—জেলখানায়।

—জেলখানায়?

—হ্যাঁ, এই নাও ইস্তাহারগুলো ধর।—বলে শশেংকা জামার বোতামগুলি খুলতেই সর্বদেহ থেকে ইস্তাহারগুলি ঝরে পড়তে লাগলো। মা সেগুলি কুড়িয়ে নিতে নিতে বললেন—ওমা, তাই তো ভাবি মেয়েটা এতো মোটা হোল কি করে? এই বোঝা বয়ে তুমি এতটা পথ এলে কি করে?

—হেঁটে।

—আহাঃ, বড্ড কষ্ট হয়েছে। বস, বস—এখনি চা করে দিচ্ছি।

বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। শশেংকা চুপিচুপি বললো—দরজা খুলো না। যদি পুলিশ হয়, তাহলে বলবে, আমাকে চেনো না। অন্ধকারে ভুল করে আমি তোমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। তারপর আমি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ি, তুমি আমার পোষাক ছাড়াতে গিয়ে এই ইস্তাহারগুলি পেয়েছ।

মা বললেন—থাক্, আমাকে বাঁচাতে হবে না।

কিন্তু পুলিশের বদলে ঘরে ঢুকলো আইভানোভিচ্। শশেংকাকে দেখে বললো—এই তো পৌছে গিয়েছ দেখছি। এই মেয়েটি পুলিশকে খুব নাকাল করেছিল, জান মা, জেলখানার একজন ইনেসপেক্টার ওকে অপমান করেছিল। ও বললে, 'ক্ষমা চাইতে হবে, নাহলে অনশন করবো।' আটদিন কিছুই খেলে না। যায়-যায় অবস্থা। শেষে সে লোকটা ক্ষমা চাইতে পথ পায় না।

মা বললেন—তাই নাকি? আটদিন কিছু না খেয়ে রইলি কেমন করে?

শশেংকা বললো—কি করি, তাকে ক্ষমা চাওয়ানোর আর তো কোন উপায় ছিল না।

রাত বাড়ছে, শশেংকা উঠে পড়লো, তাকে এখনই শহরে ফিরে যেতে হবে।

মা বললেন—রাত্রিতে এখানে থাক না?

আইভানোভিচ বললো—দিনের আলোয় এখানে ওর পথে বেরুনো চলবে না।

সে চলে গেল।

আইভানোভিচ বললো—জানো মা, ও হোল জমিদারের মেয়ে। আদর-যত্নে মানুষ হয়েছে। জেলের খাওয়া-দাওয়া তার সইবে কেন? স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে। ওর মুখ দেখলে আমার মনে হয় ওর যেন ক্ষয়রোগ ধরেছে। একটা মজার কথা জান? পাভেল ওকে বিয়ে করতে চায়।

—তাই নাকি? আমি তো কিছুই জানি না। তা বিয়ে করছে না কেন?

—কি করে হবে? ইনি যখন বাইরে থাকেন, তিনি তখন জেলে, আর তিনি যখন বাইরে ইনি তখন জেলে।

মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আইভানোভিচ বললো—ক'জনের জন্য তুমি কাঁদবে মা? আমরা বিপ্লবীরা যে সংখ্যায় অনেক। সকলের জন্য কাঁদলে শেষে চোখে যে আর জল থাকবেই না। আমাদের জীবনই এই রকম। বিয়ে আর বিপ্লব—এ দুটো এক সঙ্গে চলে না। আমার এক বন্ধু পাঁচ বছর পরে যেদিন জেল থেকে বেরুলো, বাড়ী পেঁছে দেখে তার স্ত্রীকে তখন জেলে পুরেছে। আমারও স্ত্রী ছিল মা, পাঁচ বছর জেল খেটে সে এখন কবরে পড়ে ঘুমুচ্ছে।

মায়ের চোখে জল টল টল করে।

আইভানোভিচ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বললো—যাক, এখন কাজের কথা হোক্!

পরদিন দুপুর বেলা মা খাবারের ঝুড়ি নিয়ে চললেন কারখানায়। ফটকে পুলিশ বসেছে, মজুরদের পোষাক তল্লাশ করে তবে ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে।

মা বললেন—বাবা, বুড়ো মানুষ, এই বোঝা নিয়ে আর দাঁড়াতে পারছি না। পিঠটা ভেঙে পড়লো বাবা!

দারোয়ান সন্দেহ করলো না, বললো—যা বুড়ী যা—

মা ভিতরে ঢুকলেন। ফেরিওয়ালার জায়গায় গিয়ে খাবারের ঝুড়ি নামিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন।

প্রথমে এগিয়ে এলো দু'ভাই, ভাসিলি ও আইভান। 'ভাসিলি বললো—মোহনভোগ এনেছ ?

মা বললেন—আজ নেই, কাল অনবো।

ভাসিলি কথার সঙ্কেত বুঝলো, এগিয়ে এসে হাঁড়ির ভিতর থেকে এক বাণ্ডিল কাগজ তুলে নিয়ে ভিতরের বুক-পকেটে রাখলো। আইভান কতকগুলি নিয়ে ঢুকিয়ে দিল বুটের চামড়ার ভিতর। তারপর দু'জনে চলে গেল।

কাজ সিদ্ধি হলো, মায়ের ভারী আনন্দ হোল। মা হাঁকলেন—চাই গরম ঝোল! টাট্‌কা মাংস, গরম রুটি—

অন্যান্য মজুরেরা এবার ঘিরে ধরলো মাকে। তারা এলো খাবার কিনতে।

সন্ধ্যাবেলা মা চা তৈরী করছেন এমন সময় এলো আঁদ্রে। তাকে দেখে মা কেঁদে ফেললেন। আঁদ্রে বললো—কেঁদো না মা, শীগগীর পাভেলও আসবে, তার বিরুদ্ধে তো কোন প্রমাণ পায়নি।

মা বলেন—আমি শুধু তোদের কথাই ভাবি, যে লোককে জানিস না, তার জন্য হাসতে হাসতে তোরা কারাগারে যাস, যে লোককে চিনিস না তার জন্য চলেছিস সুদূর সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে। আজও আমার অনেক জিনিস বোঝবার বাকি আছে জানি, কিন্তু তোদের আমি চিনেছি, তোরা দুঃখী মানুষের জন্য দারুণ দুঃখের জীবন বেছে নিয়েছিস। যতদিন পৃথিবীতে একদল মানুষ শুধু টাকা জামিয়ে যাবে, আরেকদল লোক দু'মুঠো অন্নের জন্য উদয়াস্ত খেটে মরবে—ততদিন পৃথিবীতে শান্তি কেউ পাবে না। তোরা কি পারবি সকলের সুখের ব্যবস্থা করতে ?

—কিন্তু তাবলে তো আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

কথায় কথায় রাত হয়ে গেল। আঁদ্রে শুয়ে পড়লো।

পরদিন দুপুরে মা খাবার নিয়ে এলো কারখানায়। ফটকের পুলিশ আজ মাকে ধরলো। মাকে আজ তারা রীতিমত তল্লাশী করে তবে ছাড়লো।

মা ভিতরে আসতেই বুড়ো সিজভ এসে বললো—শুনেছ নিলোভ্না, কাল আবার ওরা ইস্তাহার ছড়িয়ে দিয়ে গেছে কারখানার ভিতরে। মিছি মিছি এরা কতকগুলো নিরীহ লোককে ধরে নিয়ে গেল—আমার ভাইপোকে, তোমার ছেলেকে। কই, তাতেও তো বন্ধ হোল না। আরে বাপু, লোককে ধরে তোরা করবি কি? আসল ব্যাপার তো আর লোক নয়, মন—নতুন চিন্তা দেখা দিয়েছে, মানুষের চিন্তাকে তো মশা-মাছির মত ধরা যায় না।

মা হাঁকলেন—-চাই গরম ঝোল, টাট্‌কা মাংস, গরম রুটি!

মজুরেরা খাবার কিনতে এলো। সকলেই উত্তেজিত। কর্তাদের মুখ গম্ভীর।

আইভান ও ভাসিলি এলো। আইভান মাকে বললো—-দেখেছ, একদিনে কি রকম সব বদলে গেছে। ওষুধ ধরেছে।

একজন মজুর বললো—আমি একখানাও দেখতে পেলাম না, বড় আফসোসের কথা!

আরেকজন মজুর বললো—আমি দেখেই বা কি করতাম, আমি তো লেখাপড়া জানি না।

অপর একজন বললো—আমার কাছে একখানা আছে, চল, আমি তোমাদের পড়ে শোনাব।

বাড়ী ফিরে মা আঁদ্রেকে বললেন—কারখানার অনেকে পড়তে জানে না বলে দুঃখ করছিল, আমিও ছেলেবেলায় একটু-আধটু শিখেছিলাম, তাও ভুলে গেছি।

আঁদ্রে বললো—বেশ, আজ থেকে শিখতে সুরু করে দাও।

—এই বয়সে?

—শেখবার আবার বয়স কি?

আঁদ্রে বই খুলে মাকে পড়াতে বসলো, বললো—শুধু কাজ, খাওয়া, আর ঘুম,—খাওয়া ঘুমানো আর কাজ করা—জীবনটা যেন কেবল ওর জন্যই। পশুর মত বেঁচে থাকা। এদের শোষণ করেই ধনীর দৌলতখানা গড়ে ওঠে। এরা বাঁচবার অধিকার চাইলে আইন করে জেলে দেয়। এই দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে হলে চাই শিক্ষা। লেখাপড়া তোমাকে শিখতেই হবে। পাভেল ফিরে এসে তোমাকে দেখে অবাক হয়ে যাবে। তোমাকে দিয়ে তখন আমাদের অনেক কাজ হবে।

সন্ধ্যাবেলা এলো রিবিন। বললো—আঁদ্রে আছে?

—না।

—তাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম। যাক্, আপনাকেই কথাটা বলে যাই। এ জগতে টাকা ছাড়া কিছু হয় না। জন্মাতেও টাকা দরকার, মরতেও টাকার দরকার। এই সব ইস্তাহারের খরচ আসে কোত্থেকে—টাকা দেয় কে? নিশ্চয়ই আমাদের প্রভুরা। এটা তাদেরই ধাপ্পাবাজি, আমাদের কোন নতুন প্যাঁচে ফেলার চেষ্টা। তারা খরচ করে আমাদের কোন কল্যাণ করবে তা হতে পারে না। আমি তাই এখান থেকে চললাম। গাঁয়ে যাব, চাষীদের বোঝাবো, তাদের জাগিয়ে তুলবো।

—তারা তোমার কথা শুনবে?

—কেন শুনবে না? যে ভাবে বললে শুনবে, সেই ভাবে বলবো।

—ওরাই তোমাকে মারবে রিবিন।

—মারুক, ক্ষতি নেই। জানেন তো বাইবেলে যীশু বলেছেন—'তোর মৃত্যু নেই, একদিন তুই নবজন্ম লাভ করবি।' আমি কালই চলে যাবো। বিদায়!

রিবিন চলে গেল।

আঁদ্রে আসতেই মা তাকে সব কথা বললেন।

সে বললো—বেশ করেছে, গাঁয়ে যাওয়া দরকার, চাষীদের মধ্যেও তো কাজ করতে হবে।

মা বললেন—রিবিন জিজ্ঞাসা করলো যাদের সঙ্গে লড়াই, তারাই কি তোদের টাকা দিচ্ছে ?

আঁদ্রে হাসলো, বললো—তা কি হয় ? অনেক কষ্ট করে আমাদের টাকার জোগাড় করতে হয়। মজুরেরা মাইনে থেকে দেয়, ছাত্রেরা খাবারের পয়সা বাঁচিয়ে দেয়। কর্তারাও সময় সময় দেয়—কেউ দেয় তার কাজ গুছিয়ে নেবার জন্য, কেউ দেয় আমাদের ফাঁদে ফেলার জন্য, আবার কেউ কেউ এমনও আছে যে আমাদের সত্যি ভালো করতে চায়।

আঁদ্রের সত্যি কথা মায়ের ভালো লাগলো।

আঁদ্রে বলে চললো—যখনই মনে হয় আমাদের এই মহান আদর্শ একদিন বাস্তব হয়ে উঠবে, তখনই আনন্দে অধীর হয়ে উঠি, মনে হয় সারা বিশ্বের মানুষকে আমি ভালবাসি। কিন্তু ভালবাসবো কাকে ? একদিকে মানুষ রিক্ত, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, আরেক দল তাকে দু'পায়ে মাড়িয়ে চলেছে। যে বার বার আমাকে অপমান করে তাকে ক্ষমা করি কেমন করে ? আজ যদি অপমানের প্রতিকার না করি তাহলে কাল সে যে আবার অপমান করবে,—এমনি করেই অপমানের ধারা বয়ে চলবে। অত্যাচারীকে, স্বার্থপর নিষ্ঠুর লোভীকে নির্মূল করতে হবে। সব মানুষ এসে দাঁড়াবে এক সারিতে, মানুষ যা কিছু তৈরী করবে, যা কিছু উৎপন্ন করবে, সবাই নেবে সমান ভাবে ভাগ করে। কেউ অভাবে কষ্ট পাবে না, কেউ কাউকে শোষণ করবে না।

মা বললেন—সেদিন কি দেখে যেতে পারবো ?

—হয়তো দেখে যেতে পারবো না, সেদিন আসার আগেই জীবন হারাতে হবে। কিন্তু মা, সেদিন আসবেই—যারা তখন থাকবে তারা সুখী হবে।

মায়ের পড়াশুনা এগিয়ে চলে। বুড়ো মানুষ, চোখের জোর কমে গেছে, আঁদ্রে তাঁর চশমা করিয়ে দিয়েছে।

মা পাভেলের সঙ্গে দেখা করতে তিনবার গিয়েছিলেন জেলখানায়। জেলের কর্তারা তিনবার তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছে। তবে লোকটির ব্যবহার ভালো। মা এসে আঁদ্রকে বললেন—লোকটি বেশ বিনয়ী।

আঁদ্রে বললো—অমনি বিনীত ভাবেই ওরা সাধুকেও ফাঁসীতে লট্‌কাতে পারে। ওরা মানুষ নয়, ওরা এক একটা যন্ত্র। শুধু কলের পুতুলের মত ওরা হুকুম তামিল করে, ওদের মনিবেরাও তাই ওদের শেখায়।

পরের বারে পাভেলের সঙ্গে মায়ের দেখা হোল। ছেলেকে দেখে মা কেঁদে ফেললেন, বললেন—কেমন আছিস পাভেল?

পাশেই একজন প্রহরী দাঁড়িয়ে ছিল, সে বললো—অত কাছে দাঁড়ানো চলবে না, তফাতে দাঁড়িয়ে কথা বল।

মা বললেন—আর কতদিন তোকে এরা আটকে রাখবে? যে জন্য তোকে ধরেছে, সেই সব ইস্তাহার তো আবার কারা কারখানায় ছড়াচ্ছে।

পাভেলের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললো—সত্যি ?

প্রহরী বললো—ওসব কথা এখানে চলবে না, হুকুম নেই। শুধু ঘর-সংসারের কথা বল।

পাভেল বললো—বেশ বেশ, তাই হবে। ঘরের কথাই জিজ্ঞাসা করি—তুমি কাজকর্ম কিছু করছ ?

—খাবার ফেরি করি, মাংস রুটি ঝোল,—এই সব। সে সব আমিই নিয়ে যাই কারখানায়।

মা এমন ভাবে তাকালেন যে পাভেলের বুঝে নিতে কষ্ট হোল না। পাভেল বললো—যাক্, আমার বড় আনন্দ হোল, তুমি এত দিনে একটা কাজ পেয়েছ।

প্রহরী ঘড়ি দেখে বললো—কথা শেষ কর, সময় হয়ে গেছে।

মা ছেলের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

তিনদিন পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা মা আঁদ্রের সঙ্গে কথা বলছেন এমন সময় মুখে বসন্তের দাগ নিয়ে নিকোলাই এসে ঢুকলো ঘরে, বললো—জেল থেকে সোজা আসছি। তোমাদের ঘরে আলো জ্বলছে দেখে ঢুকে পড়লাম।

মা বললেন—বস বস, একেবারে শুকিয়ে গেছে। আমি একটু চা তৈরী করে আনি। তা, পাভেলকে ওরা কবে ছাড়বে ?

—পাভেলকে কবে ছাড়বে জানি না, আমাকেই কি ছাড়তো! একদিন ক্ষেপে গিয়ে ওয়ার্ডারকে বললাম—'আমাকে ছেড়ে দাও, বলছি, নইলে এখানে আমি একটা খুন করে বসবো।' পরের দিন দেখি তারা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।

চা খেতে খেতে নিকোলাই বললো—দেখ, কতকগুলো লোককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলা দরকার।

আঁদ্রে বললো—বটে, মানুষকে মেরে ফেলার অধিকার তুমি কোথায় পেলে ?

—কেন ? যে আমাকে লাথি মারে, আমারও অধিকার আছে

তাকে লাথি মারবার। তারা আমার জীবনকে কণ্টকিত করেছে, আমিও তাদের জীবনকে বিষাক্ত করে তুলবো। আমি গরবভের মাথা ভাঙবো,—নিশ্চয়ই ভাঙবো,—নিশ্চয়ই ভাঙবো!

—কেন, সে কি করলো?

—সে হোল গোয়েন্দা—নোংরা পচা দুর্গন্ধময় জীব। সে মানুষের সর্বনাশ করছে, আমার বাবাকেও গোয়েন্দার চর করে তুলেছে। তুমি আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ, একটা নেকড়ে গর্জে উঠছে।

আঁদ্রে বললো—এ তোমার মনের রোগ। মানুষ যখন জীবনকে বুঝতে পারে না বুঝতে পারে না তার স্থান কোথায়। মনে করে পৃথিবীতে আমার অন্তরের ব্যথা কেউ বুঝলো না, আমার প্রাপ্য কেউ দিল না, সবাই আমাকে শোষণ করতে চায়, তখন এই রোগ মনকে পেয়ে বসে। কিন্তু একদিন তুমি বুঝতে পারবে জীবনে তোমার স্থান কোথায়, আর পাঁচজনের সঙ্গে সুর মিলিয়েই তোমার জীবন সার্থক হবে। ধীরে এগিয়ে চলতে হবে। জীবনটা তো ঘোড়া নয় যে চাবুক মারলেই তাড়াতাড়ি ছুটবে।

—আমার অত ধৈর্য নেই। যা হবার তা তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার।

—কিন্তু আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে, নিজে শিখতে হবে, অপরকে শেখাতে হবে—এই আমাদের কাজ।

—কিন্তু লড়াই করবো কবে?

—তা জানি না, তবে তার জন্য তৈরী হতে হবে। তার আগেই হয়তো আমাদের বহু জীবন দান করতে হবে। জান নিকোলাই, ধারালো অস্ত্রের চেয়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দরকার আগে।

প্রতিদিন নূতন লোক আসে। সন্ধ্যাবেলা পাভেলের বাড়ীতে তাদের বৈঠক বসে। কত কথার আলোচনা হয়। আঁদ্রে তাদের কত কি পড়ে শোনায়।

নিকোলাইয়ের কারখানা থেকে চাকরী গেছে, সে এখন এক কাঠগোলায় কাজ করে। আঁদ্রের সঙ্গে প্রায়ই সে তর্ক করে। একদিন কথায় কথায় সে বললো—মানুষের এই নিঃস্ব দীন অবস্থার জন্য দায়ী কে? নিশ্চয়ই রুশ সম্রাট!

আঁদ্রে বললো—না। যে লোক প্রথম নিজেকে সম্পত্তির মালিক বলে মনে করছিল, বলেছিল—'এই সম্পত্তি আমার', দোষ তারই। হাজার হাজার বছর ধরে সেই কথাটা ছড়িয়ে গেছে যুগ থেকে যুগান্তরে।

—ধনিক, মহাজন ও দালালরা তাহলে নির্দোষ?

আঁদ্রে তাকে বোঝাতে চায়, নিকোলাই কিন্তু বুঝতে চায় না। বলে—ওরা সব পরগাছা, সাধারণকে শুষে খাচ্ছে, ওদের নির্মূল করতে হবে।

মা বললেন—গরবভও একদিন তোমাদের সম্পর্কে ঠিক এই কথাই বলছিল।

—গরবভ ব্যাটার বদমায়েসী আজকাল বেড়েছে।

মা বললেন—প্রায়ই রাত্তিরে আমার জানালায় উঁকিঝুঁকি মারে।

—তা না হলে সময় কাটবে কি করে? ওর মত শয়তানকে দূর করতেই হবে—নিকোলাই রাগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মা বললেন—নিকোলাইকে আমার বড় ভয় করে, কখন্ কি করে বসে।

আঁদ্রে বললো—গরবভটাও বেজায় বেড়ে উঠেছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ পাভেল এলো, মা ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন—এতদিন পরে ছুটি পেলি?

তারপর সুরু হোল অনেক দিনের জমানো যত কথা।

মা বললেন—আঁদ্রে আমাকে বলে কিনা এই বুড়ো বয়সে লেখা-পড়া শিখতে হবে।

পাভেল বললো—তাই বুঝি তুমি লুকিয়ে পড়তে সুরু করে দিলে ?

মা বললেন—লুকিয়ে পড়বার জো আছে ? হাতে-নাতে ধরে ফেললে।

আঁদ্রে খবর দিল—রিবিন গেছে গাঁয়ে চাষীদের মধ্যে কাজ করতে।

পাভেল বললো—আমি থাকলে যেতে দিতাম না, তার এখনও অনেক কিছু শিক্ষার দরকার।

আঁদ্রে বললো—আঘাতে আঘাতে তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, সে কার কথা শুনবে, কে তাকে ধরে রাখবে ?

চাষীদের মধ্যে কাজ করা নিয়ে দু'বন্ধুতে সুরু হোল আলোচনা।

মে মাস এসে পড়লো। 'মে দিবস' উৎসবের আয়োজন সুরু হোল। কত লোক আসে, বৈঠক বসে, আলোচনা হয়।

নাটাশা আসে, শশেংকাও আসে।

মা শুনতে পেলেন শশেংকা একদিন পাভেলকে বলছে—মিছিলে নিশান বয়ে নিয়ে যাবে তুমিই ?

—হ্যাঁ, আমি ছাড়া আর কেউ নিশান বইতে পারে না।

—তুমি আবার জেলে যাবে ? এখানে তুমি আর আঁদ্রের মত বিপ্লবী আর কেউ নেই, তুমি জেলে গেলে আমাদের কত ক্ষতি হবে ভেবে দেখেছ ? এবার আর ওরা তোমাকে সহজে ছাড়বে না, সরিয়ে দেবে কোন দেশে।

—তা হোক্, তবু যা সংকল্প করেছি তা থেকে এক চুলও নড়বো না।

—আমার অনুরোধ—

—তোমার এমন অনুরোধ করা উচিত নয়।

—আমিও তো মানুষ।

—সেই জন্যই তুমি আমাকে এমন অনুরোধ করতে পার না।

—আচ্ছা, তাহলে বিদায়।

মায়ের দুশ্চিন্তা হোল—মিছিলে সবার আগে নিশান হাতে

যাবে পাভেল! ঘরের মধ্যে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন—পয়লা মে কি হবে?

—মজুরদের মিছিল বেরুবে। আমি থাকবো সকলের আগে, আমার হাতে থাকবে নিশান।

—এতে বিপদ নেই?

—পুলিশ আমায় গ্রেপ্তার করতে পারে।

মায়ের চোখে জল এলো।

পাভেল বললো—তুমি আমার কর্তব্য বাধা দেবে? তোমার তো এমন কাতর হওয়া উচিত নয়।

মা বললেন—আমি মা, ছেলের বিপদে চোখের জল না ফেলে কি থাকতে পারি?

—ভালবাসা ও স্নেহ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে বাধা দেয়, সারা জীবনকে নষ্ট করে দেয়।

—আমি তোকে বাধা দোব না।

মা চোখের জল লুকোবার জন্য চলে গেলেন রান্নাঘরে।

একটু পরে পাভেল এসে দাঁড়ালো মায়ের সামনে, বললো—আমার উপর রাগ করেছ মা?

মা বললেন—আমি চাই ভগবান তোর কল্যাণ করুন। মায়ের বুকের জ্বালা তুই কি বুঝবি! তোদেরকে দেখলেই আমার কান্না পায়। আমি যদি না কাঁদি তবে তোদের জন্য কাঁদবে কে? আজ তোরা আছিস্, কাল হয়তো নিরুদ্দেশ হয়ে যাবি। আবার নতুন ছেলের দল আসবে, তারাও যাবে তোদের পিছনে পিছনে। দলের পর দল তোরা চলেছিস্ পিছনে সবই ফেলে। আমি যে দেখতে পাচ্ছি তোদের শোভাযাত্রা।

মা চুপ করে তাকিয়ে থাকেন।

কোন এক সময় মা আবার বলেন—আজকাল মনে হয় সব যেন বদলে গেছে। আজকের আনন্দ, আজকের দুঃখ যেন আলাদা। সব ঠিক বুঝি না, বোঝাতে পারিও না।

আঁদ্রে বললো—এই সময় এই রকমই হয় মা। আজকের পৃথিবী স্বার্থের আঘাতে সংক্ষুব্ধ, লোকে বিষাক্ত নীচতায় নির্মম দৈন্যে পঙ্গু। আজ সমগ্র ধরণী ব্যাধিগ্রস্ত। এরই মাঝে আজ এসেছে নতুন মানুষ, সে বলছে—ওরে অন্ধ, বাঁচার অধিকার, আনন্দের অধিকার শুধু তোর একার নয়, তা সবাইকার। সেই মানুষের আহ্বান আজ শোনা যাচ্ছে, দূর থেকে দূরান্তরে—দেশ থেকে দেশান্তরে। মানুষের দ্বারে দ্বারে সেই ধ্বনি বাজছে। উৎপীড়িত ধরিত্রীর বুকে নতুন সূর্য উঠছে। কিন্তু তবু মানুষের ভাগ্যে এখনও অনেক গ্লানি অনেক বেদনা জমে আছে। অনেক রক্ত ঝরতে এখনও বাকি আছে। তবু আজকের এই আশাই আমাদের সকল বেদনাকে সহ্য করার শক্তি দেবে যে, কোন শক্তিই একে মেরে ফেলতে পারবে না। দুর্বার অমোঘ এর শক্তি, অনিবার্য এর অভ্যুদয়।

পরদিন সকালবেলা কর্সুনভা এসে খবর দিল—গরবভ খুন হয়েছে।

মা চমকে উঠলেন, বললেন—কে খুন করলো ?

—কে খুন করলে সে কি সেখানে বসে আছে যে দেখতে পাব ?

কর্সুনভার সঙ্গে মা বেরিয়ে পড়লেন ব্যাপার দেখতে। পথে কর্সুনভা বললো—একটা ভালো যে তোমার বাড়ীর ছেলেগুলি কাল রাত্রে ঘরে ছিল। কাল রাত্রিতে এই পথ দিয়ে যাবার সময় তোমার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি তোমরা সবাই ঘরে বসে গল্প করছ।

মা চমকে উঠলেন, বললেন—কি যে বল, আমরা তাকে খুন করবো কেন ?

—সবাই জানে গরবভ্ তোমাদের উপর নজর রাখতো, তোমরা ছাড়া কে ওকে সরাবে ?

—একাজ আমরা করতেই পারি না।

মুখে বললেন এই কথা, কিন্তু মনে পড়লো নিকোলাই-এর ক্রুদ্ধ মুখখানি।

ঘটনাস্থলে এসে দেখলেন চারিপাশে ভীড়, গরবভের মৃতদেহটি পুলিশ ঘিরে রেখেছে। কোথাও রক্তের চিহ্ন নেই।

ভীড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠলো—ছুঁচোটার উচিত শাস্তি হয়েছে!

পুলিশ চীৎকার করে উঠলো—কে বললে একথা?

দেখতে দেখতে ভীড় ফাঁকা হয়ে গেল।

মা-ও আর দাঁড়ালেন না, বাড়ী ফিরে এলেন।

পাভেল ও আঁদ্রে বাড়ী ফিরতেই মা জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁ রে, কাউকে গ্রেপ্তার করেছে নাকি?

আঁদ্রে বললো—না।

—নিকোলাইকে কেউ সন্দেহ করছে না তো?

—সে তো এখানে নেই, কাল সকালে সে নদীর ওপারে কাঠ-গোলায় গেছে। এখনও ফেরে নি।

পাভেল বললো—আমি এসব বুঝতে পারি না, দু'মুঠো খেয়ে বেঁচে থাকবার জন্য যে কাউকে হত্যা করতে হবে, একথা ভাবতেও আমার বিশ্রী লাগে।

আঁদ্রে বললো—জীবনের ধর্মই এই।

পাভেল বললো—এ অন্যায়।

আঁদ্রে বললো—তুমি বলছ অন্যায়। কিন্তু যারা সৈন্য রাখছে, ঘাতক রাখছে, জেলখানা তৈরী করছে আমাদের পিষে মারার জন্য, তারাই তো আমাদের এগিয়ে দিচ্ছে অন্যায় করার জন্য।

—তুমি পার? ওরকম একটা মানুষকে খুন করতে?

—আমার দলের কাজের জন্য, কর্তব্য পালনের জন্য, বন্ধুদের মঙ্গলের জন্য আমি সব কিছু করতে পারি।

আঁদ্রে উত্তেজিত হয়ে উঠলো, বললো—ওরা পথে বাধার সৃষ্টি করে, টাকার জন্য নিজেকে বিক্রী করে, পরকেও বিক্রী করে। ওরা হোল বিশ্বাসঘাতক। ওদের খুন করা অন্যায়? ওরা যখন আমাদের হত্যা করে হাজারে হাজারে? ওরা আমাদের শত্রু।

ওদের মেরে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে না তা আমি জানি। সেদিন যখন আসবে তখন হিংসা থাকবে না, লোভ থাকবে না, এমন রক্তারক্তি, এ কাড়াকাড়ি থাকবে না, মানুষ মিলেমিশে বাস করবে। কিন্তু এখন ?

পাভেল বললো—তুমি এতো উত্তেজিত হচ্ছ কেন, কি হোল তোমার ?

আঁদ্রে বললো—আমিই গরবভকে খুন করেছি।

মা ও পাভেল চমকে উঠলেন।

আঁদ্রে বললো—কেন খুন করেছি জান ? কাল যখন কারখানার দিকে যাচ্ছি, দেখি সে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। সে আমায় বললো—'তোমাদের কথা পুলিশ সব জানতে পেরেছে, পয়লা মে'র আগেই তোমাদের যেতে হবে জেলখানায়।' বললো—'তুমি খুব চালাক লোক, একাজ ছেড়ে তুমি পুলিশের কাজে লেগে পড়, তোমার উন্নতি হবে।' এর চেয়ে অপমান কেউ আমায় করেনি। সে যদি আমাকে মারতো, সে-ও ছিল ভাল। আমি পিছন ফিরে দিলাম এক ঘুসি। তারপর সোজা চলে এলাম। শুনলাল যে ধপ করে পড়ে গেল। এখন শুনছি, সে খুন হয়েছে।

পাভেল বললো—এখন কি করবে ?

আঁদ্রে বললো—যা করেছি তা স্বীকার করতে আমার ভয় নেই। কিন্তু এমন একটা নোংরা কাজ করে জেলে যেতে লজ্জা হয়। তবে আর কেউ যদি ধরা পড়ে তা হলে আমি গিয়ে অপরাধ স্বীকার করবো, নাহলে এই নোংরা কাজ মুখ ফুটে বলতে পারবো না।

কারখানার বাঁশী বাজলো, কিন্তু সেদিন তারা কেউ কাজে গেল না।

পাভেল বললো—এই দেখ মা, আমাদের জীবন। ওরা এক দল মানুষকে করেছে আরেক দলের শত্রু, মানুষকে ওরা করেছে অস্ত্র, তারই নাম দিয়েছে সভ্যতা। ওরা যখন খুন করে তখন ওদের হাত একটুও কাঁপে না। নিজের ধনদৌলত সোনারূপা রক্ষা করার জন্য ওরা খুন করে, আর আঁদ্রে দৈবাৎ একজনকে খুন করে কি অনুশোচনা

করছে! আমাদের আদর্শ কত বড়! আমরা লড়ছি কত মহান সত্যের জন্য!

বাইরে পায়ের শব্দ হোল, ভিতরে এসে ঢুকলো রিবিন।

রিবিন বললো—আমি চাষী হয়ে গেছি, গাঁয়ে গিয়ে বাস করছি। অনেক বই নিয়ে গেছি। সবচেয়ে বেশী কাজে লাগে বাইবেল। কিন্তু সে সব বইয়ে আর কুলুচ্ছে না, এসেছি নতুন বই নিয়ে যেতে। তোমরা কিছু বই আমাকে দাও। ওখানে আমার সুবিধা হয়েছে, একজন পাদ্রী আর একজন শিক্ষিকা পড়াশুনায় খুব উৎসাহ দেন। আমি সেই ফাঁকে আমার বই সব চালিয়ে দিচ্ছি। পুলিশ টের পেলে তাদেরই ধরবে, আমাকে সন্দেহ করবে না।

পাভেল বললো—এটা কি ঠিক? আমার কাজের ফলে অন্য লোক বিপদে পড়বে, এ অন্যায়।

রিবিন বললো—এর মধ্যে অন্যায়টা কি? শিক্ষকেরা বুর্জোয়া, ওরা বিপদে পড়লে আমার তেমন দুঃখ হবে না, দুঃখ হবে সাধারণ মানুষের বিপদ ঘটলে। একজন পাদ্রী আর একজন জমিদারের মেয়ে শিক্ষিকা সেজেছেন। হাজার হাজার বছর ধরে তারা শিখে এসেছ কি করে প্রভুত্ব করতে হয়, হাজার হাজার বছর ধরে শিখেছে কি করে চাষীদের গায়ের চামড়া খুলে নিতে হয়—আজ হঠাৎ তারা লেগে গেল চাষীদের উন্নতির জন্য! এ হয় না, এ সব রূপকথার গল্প, আমি তো আর রূপকথার রাজ্যে বাস করি না।

মা বললেন—কিন্তু মালিকদের মধ্যেও তো ভালো লোক আছে যারা মানুষের কল্যাণের জন্য জেল খাটতে পারে।

রিবিন বললো—গাঁয়ে যা দেখেছি তা অসহ্য। তোমরা সহরে থাক। ক্ষুধা কি তা জান না। অত্যাচার কাকে বলে তা দেখনি। গাঁয়ে ক্ষুধা সারা জীবনের সঙ্গী। এক টুকরো রুটি খাবার আশা নেই। ক্ষুধা তাদের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করেছে, তাদের জীবন পচে গেছে। চারিধারে মালিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন তারা খাবার না পায়, পেলেই কেড়ে নেবে। আমি তাই গ্রামে গেছি। আমি চাই সেই সব

চাষীদের মাথায় আগুন জ্বালিয়ে দিতে। ওদের জাগিয়ে তুলতে হবে। সেই জন্য চাই তোমাদের বই—এমন সব লেখা যা পড়ে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে, মৃত্যুকে আঁকড়ে ধরতে ভয় পাবে না। আমি চাই মৃত্যু দিয়ে মৃত্যুর ঋণ শোধ হোক, কতকগুলো মরুক, বাকি সবাই তাহলে মানুষের মতো বাঁচার অধিকার পাবে।

পাভেল বললো—গাঁয়ের লোকদের জন্য আমরা একখানি কাগজ বের করবো, আমাদের মালমশলা জোগাও আমরা ছেপে পাঠাব।

—খুব সোজা ভাষায় লিখবে যেন গরু-বাছুরগুলোও বুঝতে পারে।

এমন সময় ভিতরে এলো এক যুবক তার নাম ইয়েফিম। রিবিন পরিচয় করিয়ে দিল—ব্যবসাদার লোক, আমার সঙ্গে মাল কিনতে এসেছে।

ইয়েফিম বইগুলি দেখতে দেখতে বললো—আপনাদের অনেক বই। বই পড়ার অবসর আপনাদের কম, কিন্তু গাঁয়ে অফুরন্ত অবসর।

পাভেল বললো—অবসর আছে, কিন্তু ইচ্ছা?

—ইচ্ছাও আছে। এখন যা দিনকাল পড়েছে, হয় মাথা ঘামাতে হবে নইলে মরতে হবে, কিন্তু মানুষ তো মরতে চায় না। তাই বইয়ের চাহিদা বাড়ছে। এটা কি বই—ভূতত্ব?

পাভেল ভূতত্ব সম্বন্ধে দু-চার কথা বললো।

রিবিন বললো—চাষীরা জানতে চায় না পৃথিবী গোল কি চৌকো, স্থির হয়ে আছে, ঘুরছে, কি দড়িতে ঝুলছে। তারা জানতে চায় কি করে জমিটা জমিদারের কবল থেকে ফেরৎ পাবে।

পাভেল ইয়েফিমকে জিজ্ঞাসা করলো—তোমার জমি-জমা কিছু আছে?

—ছিল। তা চাষ করলে আর রুটি মেলে না, বলে ছেড়ে দিয়েছি। এবার সৈন্যদলে ঢুকবো। জানি ওদের কাজ মানুষ মারা, আমি এই মারামারির অবসান করবো। সেদিন এসেছে।

—কাজটা খুবই শক্ত। কেমন করে সৈন্যদের কাছে কথাটা বলতে হবে তা জানা দরকার।

—জেনে নেবো, শিখবো।

—মালিকেরা জানতে পারলে তোমায় গুলি করে মারবে।

—তা জানি। কিন্তু মানুষ একদিন জাগবেই, এই জাগরণই হোল বিদ্রোহ।

তারপর দু'জনে পছন্দমত বই বেছে নিয়ে বিদায় নিল।

পাভেল আঁদ্রেকে বললো—রিবিনের ভিতর আগুন জ্বলছে।

আঁদ্রে বললো—চাষীদের মনও তিক্ত হয়ে উঠেছে, ওরাও মুক্তি চায়। দাসত্ব থেকে নিষ্কৃতি চায়, জমি চায়, রুটি চায়। ওরা যখন জাগবে সব ভেঙে-চুরে ওলোট-পালোট করে দেবে। যে অন্যায় ওরা এতদিন ধরে সইছে, বিপ্লবের আগুনে তা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

পাভেল বললো—তারপরেই তারা লাগবে মজুরদের বিরুদ্ধে।

আঁদ্রে বললো—কেন? আমরা তাদের বুঝিয়ে দেবো—চাষী ও মজুর একই জিনিস চায়—মুক্তি, রুটি, জমি, কারখানা, তাদের পথ আলাদা নয়।

একদিন নিকোলাই এলো, বললো—তোমরাও জান না কে গরবভকে খুন করলো, আমি মনে করেছিলাম জানোয়ারটাকে আমিই শেষ করবো।

পাভেল বললো—যা তা বকো না নিকোলাই।

নিকোলাই বললো—তোমরা সবাই এতো খাটছো, আমি শুধু তার বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, কাঠ কেটে আর কতদিন বেঁচে থাকা যায়, আমাকে একটা কাজ দাও।

পাভেল বললো—আমি তোমাকে কাজ দোব। আমরা একখানা কাগজ বের করবো, তুমি তার ছাপাখানায় টাইপ সাজানো কাজ করবে।

—বেশ! বেশ!

পয়লা মে'র উৎসব আসন্ন।

ইস্তাহারে গ্রাম আর কারখানা ভরে উঠলো।

রাত্রের অন্ধকারে গাছের গায়, বেড়ার ধারে, থানার সামনে প্রাচীরপত্র মারা হোত। সকালবেলা পুলিশ রাগে ফুলতে ফুলতে সেগুলি ছিঁড়ে ফেলতো।

দুপুর বেলা আবার গাঁয়ের পথ হ্যাণ্ডবিলে ভরে যেত।

সহর থেকে গোয়েন্দা এসেছে, কিন্তু তারা কাউকে ধরতে পারছে না।

মজুরেরা ভারী খুসি। একটা সাড়া এসেছে সবার অন্তরে।

পাভেল সারারাত গাঁয়ের বাইরে মাঠে সভা করে, ভোরে ফিরে আসে ক্লান্ত শুষ্ক মুখে।

তারপর এলো পয়লা মে।

কারখানার বাঁশী বাজলো।

মা সারারাত ঘুমুতে পারেননি। জানালার সামনে এসে নীলাভ আকাশের বুকে রক্তাভ অরুণালোকের পানে তাকিয়ে রইলেন।

আবার কারখানার বাঁশী বাজলো।

আঁদ্রে উঠে এলো জানালার সামনে, বললো—আজও সূর্য উঠছে, মেঘ ছুটছে, কিন্তু মনে হয় ওদের থেকে আমরা যেন অনেক দূরে সরে গেছি।

মা বললেন—আজ তুমি পাভেলের উপর নজর রেখো, সঙ্গে সঙ্গে থেকো।

আঁদ্রে বললো—শুধু আজ নয়, চিরদিনই সেই চেষ্টা করবো।

পাভেল ঘুম থেকে উঠে গুণ গুণ করে গান ধরলো—জাগো, জাগো, নিপীড়িত মানুষ, জাগো—

চা খেতে খেতে আঁদ্রে বললো—আমার বয়স তখন বছর দশেক, তখন একবার সাধ হয়েছিল কাঁচের গেলাসে রোদ ভরে রাখবো। দেয়ালের গায়ে রোদ এসে পড়েছে, কাঁচের গেলাসটা সজোরে বসিয়ে দিলাম দেয়ালে। গেলাস ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল,

তার উপর হোল প্রহার। বড় রাগ হোল সূর্যের উপরে। বাড়ীর বাইরে ডোবার জলে রোদ এসে পড়েছিল, সেই জলে লাথি মারতে লাগলাম। সর্বাঙ্গ কাদায় ভরে গেল। আবার প্রহার খেতে হোল। তখন আর কি করি, জানালার উপর বসে সূর্যের দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচে বললাম—আমার তো লাগেনি, আমার কচুটি!

মা বললেন—আজকের শোভাযাত্রার কি হবে?

পাভেল বললো—সব ঠিক হয়ে আছে।

আঁদ্রে বললো—আমরা যদি গ্রেপ্তার হই, নিকোলাইর মুখ থেকে তুমি সব খবর পাবে।

এমন সময় একজন ছুটে এসে খবর দিল—দলে দলে লোক রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। কারখানার ফটকে নিকোলাই, গুসেভ্ সামোলভ বক্তৃতা করছে।

পাভেল বললো—আমরাও তৈরী, চল।

মাও বেরিয়ে পড়লেন তাদের সঙ্গে।

পথে লোকের ভীড়। দরজায়, জানালায়, চারিদিকে লোক।

প্রৌঢ় মজুর মিরোলভের সঙ্গে দেখা, সে বললো—হ্যাঁ হে, তোমরা নাকি আজকে এক ভয়ানক কাণ্ড করবে? পুলিশ সাহেবের জানালা দরজা ভাঙবে?

পাভেল বললো—কেন? আমরা কি মাতাল?

আঁদ্রে বললো—আমরা ওসব কিছুই করবো না, আমরা শুধু নিশান হাতে পথ দিয়ে গান গেয়ে যাব, সে গান মজুরদের মুক্তির গান।

মিরোনভ বললো—আমি তোমাদের বই পড়ি, সব জানি। মা, তুমিও চলেছ ওদের সঙ্গে বিদ্রোহ করতে?

মা বললেন—হ্যাঁ।

আরেক জন বললো—তুমিই তাহলে কারখানায় ইস্তাহার ছড়িয়ে যেতে?

পাভেল বললো—কে বলে এ কথা ?

—কে আর বলবে, লোকের ধারণা।

পাভেল বললো—মা, তোমাকেও তাহলে জেলে যেতে হবে দেখছি।

—দরকার হয় তো যাব, তাতে কি !

এদিকে বেলা বাড়ে, ভীড়ও বাড়তে থাকে।

পথের এক মোড়ে নিকোলাই বক্তৃতা করছিল— ফল থেকে যেমন রস নিংড়ে বের করে, তেমনি আমাদের আনন্দ আমাদের অনুভূতিকে ওরা নিংড়ে বের করে নিয়েছে।

জনতা সাড়া দিল—ঠিক কথা ! ঠিক !

নিকোলাইকে সরিয়ে দিয়ে বক্তৃতা সুরু করলো আঁদ্রে—কমরেড, ওরা আমাদের শিখিয়েছে জগতে নানা জাতি আছে, ইংরেজ, জার্মান, ফরাসী, ইহুদী—আরও কত কি ! কিন্তু আসলে জগতে আছে দুটি জাত, ধনী আর গরীব। তাদের কথা আলাদা, পোষাক আলাদা, ধর্ম আলাদা। মজুরদের সঙ্গে ব্যবহার করবার বেলা ইংরাজ ধনী, জার্মান ধনী, রুশ ধনী সবাই এক। আর আমরা গরীব রুশ মজুর, গরীব ফরাসী মজুর, গরীব ইংরাজ মজুর যারা শিয়াল-কুকুরের মতো জীবন যাপন করি, আমরা সবাই এক। আজ পয়লা মে, আজ সকল দেশের শ্রমিকের সঙ্গে আমরা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবো। আজ আমরা এক প্রাণ। আজ সুখের জন্য, মুক্তির জন্য, সত্যের জন্য আমাদের জীবন আহুতি দিতে প্রস্তুত হবো।

চীৎকার উঠলো—পুলিশ ! পুলিশ !

অশ্বারোহী সৈন্যরা এলো। জনতা ভেঙে গেল। মা আঁদ্রেকে এক পাশে টেনে নিলেন।

তারা এলো গির্জার বাগানে। সেখানে জনতা জটলা করছিল। একটা উচু জায়গায় উঠে পাভেল বক্তৃতা সুরু করলো—কমরেড, সময় এসেছে, আমাদের এই জীবনধারা বদলাতে হবে। মানুষ বলে আমাদের গণ্য করা হয় না, আজ আমরা প্রচার করবো আমরা কে।

আমরা সত্য ন্যায় ও স্বাধীনতার নিশান তুলে ধরবো। এই আমাদের নিশান।

পাভেলের হাতের লাল নিশান উড়তে লাগলো আকাশে। পাভেল চীৎকার করে উঠলো—দীর্ঘজীবী হোক আমাদের এই বঞ্চিত মজুরের দল!

সহস্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনি উঠলো—দীর্ঘজীবী হোক্ আমাদের সঙ্ঘ!

আঁদ্রে বললো—বন্ধুগণ, আজ আমরা এক নতুন দেবতার নামে, —সাম্য প্রীতি ও মুক্তির দেবতার নামে আমরা দীর্ঘ পথে তীর্থ যাত্রায় বেরিয়েছি। দীর্ঘ বন্ধুর পথ। যে ভীরু, যে সত্যের জন্য জীবন দিতে পারবে না, সে আজ এসো না। যে আছ আত্মবিশ্বাসী, যে আছ বন্ধু, এগিয়ে এসো আমাদের সঙ্গে, এই মে মাসের প্রথম দিনে—মহোৎসবের দিনে।

পাভেল সামনে এসে দাঁড়ালো, পিছনে সারি দিয়ে দাঁড়ালো জনতা, মিছিল এগিয়ে চললো, শতকণ্ঠে সংগীত উঠলো—

জাগো জাগো, নিপীড়িত মানুষের দল—
ঐ রণভেরী বাজে, ক্ষুধিত মানব, এগিয়ে চল!

মিছিল এগিয়ে চললো।

একজন বললো—এই মিছিল করে, গান গেয়ে কি হবে?

আরেক জন বললো—কিছুই হবে না. হুজুগ!

একজন বললো—দেখ না কি হয়, সৈন্য আছে ইস্কুল-বাড়ীর কাছে, কারখানার কাছে।

সহসা গানের সুর কেটে গেল। দেখা গেল সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা মানুষের পাঁচিল, তাদের কাঁধের তলোয়ার সূর্যের আলোয় ঝক্‌মক্ করছে।

পাভেল চীৎকার করে উঠলো—এগিয়ে চল!

কিন্তু জনতা ছড়িয়ে পড়লো। পাভেলের পাশে রইল শুধু আঁদ্রে, ভেসভ ও ফিডিয়া। শেষ পর্যন্ত মাত্র কুড়ি জন লোক গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চললো।

এমন সময় আদেশ শোনা গেল—বন্দুক নীচু ! আগে বাড়ো !

সামনের পাঁচিল নড়ে উঠলো, একজন অফিসার এগিয়ে এসে বললো—ফিরে যাও ! ভাগো !

পাভেল কিন্তু নড়লো না।

হুকুম হোল—নিশানটা কেড়ে নাও !

একজন সৈনিক এগিয়ে এসে পাভেলের হাত থেকে নিশানটা কেড়ে নিলে।

হুকুম হোল—গ্রেপ্তার করো !

বেয়োনেট নিয়ে সৈন্যরা এগিয়ে এলো। মা শুনলেন কাতর কণ্ঠে কে বলে উঠলো—ওঃ !

উন্মাদের মত মা চীৎকার করে উঠলেন—পাভেল !

সৈন্যদলের মধ্যে থেকে পাভেলের গলা শোনা গেল—মা, বিদায় !

তারপরেই শোনা গেল আঁদ্রের গলা—মা, বিদায় !

মা স্বস্তি পেলেন—তাহলে তারা বেঁচে আছে ! চীৎকার করে ডাকলেন—পাভেল ! আঁদ্রে !

দু'জনে সৈন্যদের ভিতর থেকে বললো—বিদায় বন্ধুরা ! বিদায় !

একজন সৈনিক মাকে ধাক্কা দিয়ে বললো—সরে যা মাগী, এখান থেকে।

মায়ের চোখে পড়লো পায়ের নীচে পাভেলের নিশানটা পড়ে আছে। তার লাল কাপড়ের টুকরোটা মা তুলে নিলেন। সৈনিকটি সেটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পায়ের তলায় ফেলে মাড়িয়ে দিল।

দূরে শোনা গেল মজুরদের মিলিত সংগীত ঃ

জাগো, ঘুমন্ত মজুরের দল, জাগো—

হুকুম হোল—সার্জেন্ট, গান থামাও!

কে একজন বলে উঠলো—মুখ বন্ধ করে দাও ওদের!

গানের ক্ষীণ রেশটুকু বারেক কেঁপে উঠেই স্তব্ধ হয়ে গেল।

মা সেই নিশানের কাপড়টুকু কুড়িয়ে নিয়ে চলতে সুরু করলেন। কিছুদূর গিয়ে দেখলেন এক গলির মোড়ে অনেক লোক জমায়েৎ হয়েছে। তারা কোলাহল করছে। মা সেই ভীড়ের মধ্যে ঢুকে চীৎকার করে বলে উঠলেন—বন্ধুগণ, তোমরা মানুষ। একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখ, আমাদেব ছেলেরা তোমাদের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছে। তারা লড়ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, মিথ্যার বিরুদ্ধে। লোভীরা আজ চারিধার থেকে আমাদের পিষে মারছে। ওরা লড়াই করছে দুনিয়ার শোষিত মানুষের জন্য, সকল মজুরের জন্য। তোমরা ওদের ছেড়ে যেও না, ওদেরকে বিপদের মুখে ফেলে পালিয়ে যেও না। ওদের সাহায্য কর, নিজেদের বিশ্বাস কর!—

মায়ের সারা দেহ অবশ হয়ে পড়লো, তিনি মূর্ছিত হয়ে সেখানেই পড়ে গেলেন। কে একজন তাঁকে পিছন থেকে ধরে ফেললো।

সারাটা দিন মায়ের আচ্ছন্নের মত কেটে গেল। কোন একসময় একবার জানালার সামনে এসে দাঁড়ালেন, আবার মাথা নীচু করে ঘরময় ঘুরে বেড়ালেন। চোখের সামনে ভাসতে থাকে মজুরদের মিছিল, তাদের গানের রেশ যেন শুনতে পান, দেখতে পান

সৈনিকরা বেয়োনেট হাতে মিছিলের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। মনের চঞ্চলতা যায় না।

সন্ধ্যাবেলা পুলিশ এলো। পুলিশের কর্তা মাকে উপদেশ দিল—এ তোমার নিজেরই দোষ, তোমার ছেলেকে শেখাতে পারনি ভগবান আর রাজাকে ভক্তি করতে!

তারা ঘর খানাতল্লাসী করলো।

পুলিশ চলে যাওয়ার পর মা আবার এসে দাঁড়ালেন জানালার ধারে। তাকিয়ে রইলেন অন্ধকারের পানে। পিদিমে তেল ছিল না, পিদিমটা কখন নিভে গেল।

আরো কতক্ষণ জানালায় দাঁড়িয়ে থাকার পর অবসন্নের মত মা শুয়ে পড়লেন।

পরদিন দুপুরে এলো নিকোলাই, বললো—পাভেলের সঙ্গে কথা হয়েছিল তাদের গ্রেপ্তারের পর আমি যেন আপনাকে সহরে নিয়ে যাই।

—আমি কারও গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাই না।

—আপনি আমার বাড়ীতে থাকবেন, সেখানে আমি আর আমার বোন ছাড়া আর কেউ নেই।

—সেখানে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকবো?

—সেখানে অনেক কাজ পাবেন।

—আমি ঘরকন্নার কাজের কথা বলছি না। আমি চাই জগতের কোন কাজ।

—যে কাজ আপনি চাইবেন, সেই কাজই পাবেন।

—কিন্তু আমি কি করতে পারি? কি আমার কাজ?

—অনেক কাজ আছে। যেমন ধরুন পাভেলের সঙ্গে দেখা করে যে চাষীটি খবরের কাগজের কথা বলেছিল, তার ঠিকানাটা জেনে আসা।

মা বললেন—তার ঠিকানা আমি জানি। কাগজ দাও, আমি দিয়ে আসছি।

মায়ের মনে হল তিনি যেন তীর্থ যাত্রায় বেরুবেন। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াবেন, যীশুর নামে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাইবেন। দিনান্তে শুধু একটুকরো রুটি হলেই তাঁর চলে যাবে।

মা বললেন—সামান্য একটা গাছ, সে-ও ছায়া দেয়. কাঠ দেয়, শীতের দিনে আগুন জ্বেলে লোকে আনন্দ পায়। বোবা গাছ সে-ও কাজে লাগে। আর আমি জীবন্ত মানুষ, কোন কাজে লাগবো না? ছেলেরা স্বাধীনতার জন্য, মুক্তির জন্য নিজেদের হাসতে হাসতে বিলিয়ে দিচ্ছে আর আমি ছেলের মা হয়ে শুধু দাঁড়িয়ে তাই দেখবো? আমার ছেলে প্রাণ দিতে পারে, আর আমি মা চুপ করে বসে থাকবো?

চারদিন পরে মা শহরে চলে গেলেন।

নিকোলাইয়ের বাড়ী। অর্থাৎ একটি বাড়ীর দোতলার তিনখানি ঘর। সামনে ফুলের বাগান। চারিপাশ নিস্তব্ধ। বাগানের দিকের ছোট একখানি ঘরে মায়ের থাকার ব্যবস্থা হোল।

নিকোলাই বললো—আমি সরকারী কর্মচারী। আমার কাজ হোল চাষীদের অবস্থা লক্ষ্য করে উপরওয়ালাকে জানানো। তারা খেতে পায় না মরে যায়, তাদের ছেলেমেয়েরাও সকলে মরে, তাদের দুঃখকষ্টের কারণটা আমরা জানি, কিন্তু তাদের দুঃখ দূর করার কোন চেষ্টা আমরা করি না। সেইজন্য আমরা মাইনে পাই।

মা বললেন—তুমি কি ছাত্র নও?

—না। আমি ছিলাম গ্রাম্য শিক্ষক। গাঁয়ের চাষীদের আমি বই পড়তে দিতাম। সেই দোষে আমার জেল হয়। তারপর এক বইয়ের দোকানে চাকরি নিই। সেখানেও পুলিশের চোখে অসং হওয়ার জন্য আবার আমার জেল হোল। তারপর আমাকে নির্বাসিত করা হোল আর্চেঞ্জেলে। সেখানকার উপরওলার সঙ্গে একদিন হোল হাতাহাতি। সেখান থেকে আমাকে নির্বাসিত করলো শ্বেতসাগরের তীরে এক নির্জন গাঁয়ে। সেখানে ছিলাম পাঁচবছর।

মা অবাক হয়ে গেলেন। এতো দুঃখ পেয়েছে, অথচ এমন নির্বিকার! কারও প্রতি কোন আক্রোশ নেই।

নিকোলাই বললো—আজ আমার দিদি সোফিয়া আসবে।

—তার বিয়ে হয়েছে?

—হয়েছিল, এখন বিধবা। তার স্বামীকে নির্বাসন দেয় সাইবেরিয়ার এক গাঁয়ে। সেখান থেকে পালানোর সময় ঠাণ্ডা লেগে সে মারা যায়।

—সে কোথায় থাকে?

—সর্বত্র। যেখানে সাহসী লোকের দরকার সেখানেই সে আছে।

সোফিয়া এলো দুপুর বেলা। সুসজ্জিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা। মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কিন্তু সোফিয়া এমনভাবে আলাপ করলো যেন কতকালের চেনা।

সোফিয়া বললো—আমাদের এখন সবচেয়ে বড় কাজ কি জানেন? বিচারে পাভেল নির্বাসিত হবে। আমরা তাকে সাইবেরিয়া থেকে লুকিয়ে সরিয়ে আনবো।

—কিন্তু কতদিন সে লুকিয়ে থাকতে পারবে?

—সে জন্য ভাবনা নেই। কত লোক এমনি পলাতক হয়ে আছে। এইমাত্র একজনকে নিরাপদে পার করে দিয়ে এলাম। তার নির্বাসন হয়েছিল পাঁচ বছর, কিন্তু ছিল মাত্র সাড়ে তিনমাস। এই যে আমার এতো সাজ-পোষাক দেখছেন, এ সব পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য।

সোফিয়া পিয়ানো বাজায় চমৎকার, মাকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনালো। শুনতে শুনতে মায়ের মনে পড়ে গেল, অতীতের স্মৃতি। এক রাত্রে স্বামী কারখানা থেকে ফিরে এসে তাকে লাথি মেরে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছিল। ছোট্ট ছেলেটিকে কোলে নিয়ে সারারাত জলার ধারে একটা ঝোপের মধ্যে তিনি লুকিয়ে ছিলেন।

বাজনা শেষ হলে মা নিজের জীবনের কাহিনী বললেন।

সোফিয়া বললো—আমার জীবনে অনেক দুঃখ এসেছে, কিন্তু আপনার দুঃখের তুলনায় তা কিছুই নয়।

নিকোলাই বললো—আমি ভাবতাম জীবনকে আমি জানি, বুঝি, কিন্তু আপনি যে জীবনের কথা বললেন তা আমি ভাবতেও পারি না।

একদিন ভোর বেলা মা ও সোফিয়া বেরিয়ে পড়লো কাঠকুড়ানীর বেশে। কাঁধে থলি, হাতে লাঠি।

গ্রামের পথ। মা বললেন—চলতে পারবে ?

সোফিয়া হাসলো, বললো—এই পথে কি জীবনে এই প্রথম যাচ্ছি ?

সোফিয়া বলে চললো তার জীবনের বিচিত্র কাহিনী। কতবার নাম বদলেছে। ছদ্মবেশে কত জায়গা ঘুরেছে। নির্বাসন থেকে কত রাজবন্দীর পালানোর ব্যবস্থা করেছে। পুলিশ এসেছে, ঝি সেজে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে। কখন বা কেরোসিন তেলওয়ালী সেজে সহরের একদিক থেকে চলে গেছে আরেক দিকে। একবার তো সন্ন্যাসিনী সেজে এক গোয়েন্দার সঙ্গে ট্রেনের একই কামরায় ভ্রমণ করেছিল। গোয়েন্দাটি তারই সন্ধান করছিল। এক একবার স্টেশনে গাড়ী থেমেছে আর সে কামরাগুলি ঘুরে দেখে এসে সোফিয়ার পাশে এসেই বসেছে কিন্তু তাকে চিনতে পারেনি।

মা বললেন—তোর জীবন বড় দুঃখের। তোদেরকে আমার বড় ভাল লাগে। তোরা মানুষের মনে পৌঁছবার সোজা পথটা জানিস। তোরা পাপকে জয় করেছিস। তাকে একেবারে ক্ষয় কর।

সেফিয়া বললো—নিশ্চয় আমরা জয়ী হব। মজুরেরা রয়েছে আমাদের সঙ্গে। তারা হোল মহাশক্তির ভাণ্ডার।

সোফিয়া গান ধরলো—আকাশের গান, বসন্তের গান, ভল্গা নদীর গান।

গান গাইতে গাইতে দু'জনে পথ চলে।

তিনদিন পরে তারা এসে পৌঁছলো এক গাঁয়ে। এক চাষীর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে তারা রিবিনের বাড়ীতে এসে পৌঁছালো। রিবিন তখন খেতে বসেছিল, সঙ্গে ভাই ইয়াফিম আর দু'জন চাষী।

মা বললেন—আমরা তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছি, এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে যাই। এটি হোল আমার বন্ধু, নাম আনা।

রিবিন সঙ্গী দু'জনের পরিচয় দিল—ইনি ইয়াকভ, ইনি ইগনাট। তারপর রিবিন জিজ্ঞাসা করলো—মা, পাভেলের খবর কি ?

মা বললেন—সে জেলে।

—আবার জেলে ? আবার জেলে গেল কেন ?

মা পয়লা মে'র কথা বললেন।

রিবিন বললো—এবার কি রকম শাস্তি হবে কিছু শুনেছেন ?

—হয় সশ্রম কারাবাস, নাহয় সাইবেরিয়ায় নির্বাসন।

—পাভেল নিশ্চয়ই জানতো এবার তার শাস্তি হবে। সে জানতো হয় বেয়োনেটের আঘাতে আহত হতে হবে, নাহয় নির্বাসনে যেতে হবে। সে জানে তাকে এগিয়ে চলতেই হবে, তাই সে চলে গেল।

কথায় কথায় রিবিন প্রশ্ন করলো—আপনি বইগুলি নিয়ে এসেছেন ?

মা বললেন—হ্যাঁ, এনেছি।

রিবিন বললো—আমি জানি,—আমি জানি যে শুধু এর জন্যই আপনি এতটা পথ হেঁটে এসেছেন। ওরা বুঝতে পারেনি ওরা কিসের বীজ ছড়িয়ে চলেছে, বুঝবে সেদিন, যেদিন আমরা জাগবো, সব আগাছা উপড়ে ফেলে সমান করে দোব।

তারপর রিবিন বললো—সেদিন একজন সরকারী কর্মচারী আমাকে ডেকে বললো—'এই বদমায়েস, পাদ্রীকে তুই কি বলেছিস ?' বললাম—'কিসে আমি বদমায়েস হলাম ? আমি কারও কোন অনিষ্ট করিনি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে খাই। আমি হলাম

বদমায়েস ?' লোকটা আমার মুখে মারলো এক ঘুসি। তিনদিন আটকে রাখলো আমাকে হাজতে। আমি তাদের ক্ষমা করবো না। আমি প্রতিশোধ না নিতে পারি, আমার ছেলেরা নেবে। আমি কি আর এমন বলেছিলাম পাদ্রীকে ? সে চাষীদের বোঝাচ্ছিল—'মানুষ হোল ভেড়ার পাল। তাদের জন্য চাই একজন রাখাল।' আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম—'নেকড়েকে যদি মেষপালক করা যায় তাহলে মেষ আর একটাও থাকবে না, থাকবে কতকগুলো শিং আর ক্ষুর।' তিনি বললেন—'ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর যে, ভগবান, আমাদের ধৈর্য দাও, সহিষ্ণুতা দাও!' আমি বললাম, 'কিন্তু ভগবানের সময় কোথা ?' পাদ্রী বললো, 'তুমি প্রার্থনা কর ?' বললাম, 'করি বৈকি। নিত্য প্রার্থনা করি, 'হে প্রভু, যারা মানুষ চরিয়ে খায় তাদের দিয়ে ইট বওয়াও, পাথর ভাঙাও, কাঠ কাটাও!"

তারপর সহসা সোফিয়ার পানে তাকিয়ে রিবিন বললো—আপনি তো বড় ঘরের মেয়ে !

সোফিয়া চমকে উঠলো, বললো—কেন, বলুন তো ?

—আপনি ছদ্মবেশ পরলেও নিজেকে ঢাকতে পারেন নি, ভিজে টেবিলে হাত পড়তেই আপনি হাতখানি টেনে নিলেন, ভিজে টেবিলে হাত রাখা আপনার অভ্যাস নেই। তাছাড়া চাষীর মেয়েরা অমন সোজা হয়ে বসে না।

মা বললেন—তুমি কেন ওকে এসব কথা বলছ ? সোফিয়া আমাদের বন্ধু, পুরানো কর্মী।

রিবিন জিজ্ঞাসা করলো—কতদিন ধরে আপনি আমাদের কাজ করছেন ?

—বারো বছর।—সোফিয়া বললো।

—জেল খেটেছেন ?

—হ্যাঁ।

—দেখুন, আমার কথায় রাগ করবেন না, ভদ্রলোক আর চাষীতে কিছুতেই মিশ খায় না, যেন জল আর আলকাত্‌রা।

সোফিয়া বললো—তুমি কেন ভাবছ আমি ভদ্রঘরের মেয়ে? আমি তোমারই মত একজন মানুষ।

—হতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস করা বড় কঠিন। তবে পণ্ডিতেরা বলেন কুকুরেরাও নাকি একসময় নেকড়ে বাঘ ছিল। যাক, এখন বইগুলি দিন, লুকিয়ে ফেলা যাক্!

বই আর কাগজ নিয়ে তারা পড়তে বসে গেল।

মা ও সোফিয়া শুয়ে পড়লেন।

সূর্যের শেষ আলো ক্ষীণ হয়ে গেল। অরণ্য ও গ্রাম আচ্ছন্ন করে নেমে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার।

রিবিনরা কাজ থেকে ফিরে এলো চা খেতে।

শুকনো ডাল-পালা জ্বেলে সেই আগুনে পাঁউরুটি সেঁকা হোল।

এমন সময় সামনের জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো এক দীর্ঘকায় লোক, লাঠিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে সে এগিয়ে এলো। লম্বা কোট, খোঁচা খোঁচা চুল, কোটরে বসা চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে, কংকালসার শীর্ণ একটি মানুষ।

রিবিন তার পরিচয় করিয়ে দিল—সাভেলি।

সাভেলি বললো—আপনিই চাষীদের জন্য বই এনেছেন?

মা বললেন—হ্যাঁ।

—তাদের হয়ে আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। ওরা এখনও বইয়ের ভাষা বুঝতে পারে না, কিন্তু আমি বুঝি, আমি জীবন দিয়ে তা উপলব্ধি করেছি।

কথা বলতে বলতে তার শ্বাস কষ্ট দেখা দিল, হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললো—চেয়ে দেখুন আমার দিকে। আমার বয়স মাত্র আটাশ। দশ বছর আগে আমি অনায়াসে পাঁচমণ জিনিষ বইতে পারতাম, ভাবতাম আমি আশী বছর বাঁচবো, কিন্তু আজ আমি মরতে

চলেছি, আমার জীবন থেকে পঞ্চাশটি বছর ওই মালিকেরা চুরী করে নিয়েছে।

সাভেলি হাঁপাচ্ছিল, ইয়াকভ্ তাকে টেবিলের পাশে বসিয়ে দিল। একটু দম নিয়ে সাভেলি বলতে লাগলো—আমি কাপড়ের কলে কাজ করতাম। আমার মনিব সহরের সেরা সুন্দরীকে মুখ ধোবার টব তৈরী করে দিলেন, সোনা দিয়ে তার সমস্ত প্রাসাধনের সামগ্রী তৈরী করে দিলেন। সেই সোনার মধ্যে রয়েছে আমার সারা জীবন, আমার বুকের রক্ত। তার জন্যই আমার জীবন নষ্ট হয়ে গেল। আমাকে না খাটালে তারা সুখে থাকতে পাবে না, বিলাসিতা করতে পাবে না, সে যাকে ভালবাসে তার জন্য সোনার টব হয় না।

ইয়েফিম হেসে বললো—শুনেছি, ভগবান নাকি নিজের প্রতিমূর্তি করে মানুষকে গড়ে ছিলেন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি কি কাজেই লাগছে—খাশা!

রিবিন বললো—শুধু নিজের আনন্দের জন্য ওরা মানুষকে নির্যাতন করে। আমাদের বুকের রক্ত দিয়ে ওরা তৈরী করে ওদের ছেলেদের খেলনা, ঘোড়া, গাড়ী, বাড়ী, সোনার কাঁটা-চামচে। তুমি রাতদিন খাটো, আমি টাকা জমিয়ে সোনার টব কিনি। চমৎকার! এসব লোককে সাধারণের সামনে এনে টুকরো টুকরো করে কেটে মাংসপিণ্ডগুলো কুকুরের মুখে ফেলে দেওয়া উচিত। মানুষ যখন জাগবে তখন তৈরী করবে এক বিরাট বধমঞ্চ, সেই মঞ্চে ওদের রক্তধারায় ধুয়ে ফেলবে এতকালের পাপ, অনাচার ও অন্যায়।

সাভেলি কাসছিল আর কাঁপছিল, বললো—শীত করছে।

ইয়াকভ তাকে আগুনের পাশে বসিয়ে দিল।

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল, তবু সাভেলি হাঁপাতে হাঁপাতে বললো—আমি চাই তোমরা এর প্রতিশোধ নেবে।

ইগনাট বললো—রোজ রোজ এই এককথা শুনতে হলে রীতিমত ধৈর্যের দরকার!

রিবিন বললো—কিন্তু ওই ক'টা কথাই হোল ওর সমস্ত জীবনের দাম।

মা বললেন—রোজ যেখানে লাখ লাখ মানুষ এই ভাবে জীবন পাত করছে, আর তাদের মেহনতের পয়সা নিয়ে লোক বিলাসিতা করছে, তখন আর কোন্ কথা শুনবে তোমরা ?

সাভেলি মাটিতে শুয়ে পড়লো। ইয়াকভ একটি ভেড়ার চামড়া এনে তার গায়ে জড়িয়ে দিল।

সোফিয়া গল্প বলতে সুরু করলো—মানুষের মুক্তি সংগ্রামের কাহিনী, জার্মান চাষীদের কথা, আইরিশ মজুরদের কথা, ফ্রান্সের মজুরদের কথা। সোফিয়া বললো—শীগগীর এমন দিন আসছে যেদিন তুনিয়ার মজুরেরা মাথা তুলে দাঁড়াবে, স্পষ্ট বলবে—'এরকম জীবন আমরা চাই না।' সেদিন যারা মানুষকে মেরে ক্ষমতার ভেল্কী খেলছে তাদের সিংহাসন টলবে, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে।

ভোরের দিকে সোফিয়া নীরব হোল। মা বললেন—এবার তাহলে আমরা এখান থেকে বিদায় নিই।

মা ও সোফিয়া বেরিয়ে পড়লেন।

নানা কাজে মায়ের দিন কাটে। দলের কতলোক সেখানে আসে, আসে শশেংকা, আসে নাটাশা।

অবসর সময় মা বাগান করেন, বই পড়েন, বইয়ের ছবি দেখেন।

মাঝে মাঝে নিষিদ্ধ বই আর ইস্তাহার বিলি করতে বের হন।

কখন রমণী সেজে, কখন ফেরিওয়ালার বেশে, কখন তীর্থযাত্রীর পোষাকে, কখন বা বড়লোকের বিধবা স্ত্রীর ছদ্মবেশে।

চারিদিকে তিনি দেখতেন মানুষ নানাভাবে মানুষকে বঞ্চনা করছে। ঐশ্বর্যের মাঝে থেকেও মানুষ খেতে পাচ্ছে না। নগরে

নগরে গির্জা তৈরী হচ্ছে। সোনা-রূপার সেখানে ছড়াছড়ি। কিন্তু তারই দরজায় ভিখারীর দল শীতে কাঁপছে। যাদের জন্য গির্জার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তারাই দাঁড়িয়ে আছে গির্জার বাইরে ভিখারীর বেশে। যীশুখ্রীষ্ট ছিলেন দরিদ্রের বন্ধু, তাঁরই সোনার মূর্তি গির্জায় গির্জায় সাজানো আছে। পাখীকে ভয় দেখানোর জন্য ক্ষেতে যেমন ন্যাকড়ার মানুষ টাঙানো থাকে, এ যেন তেমনি চাষীদের ভয় দেখানোর জন্য একটা নকল ভগবান টাঙিয়ে রেখেছে!

একদিন বিকালে নিকোলাই আফিস থেকে ফিরে এসে বললো—জেল থেকে আজ একজন কয়েদী পালিয়েছে, কিন্তু কে তা জানা যায় নি!

মা কেঁপে উঠলেন, বললেন—পাভেল নয়ত?

—হতেও পারে। তাকে খুঁজে বের করতে হবে, লুকিয়ে রাখতে হবে ত! পথে ঘুরছিলাম, যদি তাকে দেখতে পাই। আবার এখনি বেরুবো।

মা বললেন—আমিও যাব।

—তুমি এখনি একবার ইগরের কাছে যাও। সে যদি কোন খবর পেয়ে থাকে!

মা তখনই বেরিয়ে পড়লেন। ইগরের বাড়ী পৌঁছে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাচ্ছেন, এমন সময় চোখে পড়লো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ভেসবশ্চিকফ। প্রথমে মনে হোল চোখের ভুল, তারপরেই বুঝলেন ভুল নয়, ডাকলেন—ভেসব!

ভেসব চাপা গলায় উত্তর দিল—আপনি এগিয়ে যান।

মা তাড়াতাড়ি ইগরের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ইগরের অসুখ, সে বিছানায় শুয়েছিল। মা তার কানে কানে বললেন—ভেসব জেল থেকে পালিয়ে এখানে এসেছে।

ইগর হেসে বললো—চমৎকার! কিন্তু আমার তো উঠবার শক্তি নেই।

এমন সময় ভেসব এসে ঘরে ঢুকলো। বললো—আপনার

সঙ্গে দেখা না হলে আমাকে আবার জেলেই ফিরে যেতে হোত। কাউকেই আমি চিনি না, আর কিছুক্ষণ বাইরে থাকলেই আবার ধরা পড়তাম।

ইগর বললো—বসো ভাই, কি করে পালালে ?

ভেসব বললো—জেলের মধ্যে বিকাল বেলা ছাড়া পেয়ে হাওয়া খাচ্ছিলাম। এমন সময় দেখি জেলের ওভারসিয়ারকে ধরে কয়েদীরা প্রহার লাগাচ্ছে। সুরু হয়ে গেল হট্টগোল। পাগলা ঘণ্টি বেজে উঠলো। ফটকের কাছে গিয়ে দেখি—ফটক খোলা। বাইরে বেরিয়ে এলাম, কেউ কিছু বললো না। তারপর পিছন পানে তাকিয়ে দেখি দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। সেই থেকে ঘুরছি পথে পথে, এখন যাই কোথা ?

মা বললেন—পাভেল কেমন আছে ?

—ভালো আছে।

এদিক ওদিকে তাকিয়ে ভেসব বললো—ভীষণ খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দিতে পার ?

ইগর বললো—তাকের উপর পাঁউরুটি আছে, ওকে দাও মা। আর ওই বাঁ পাশের ঘরে লুডমিলা থাকে, তাকে বল খাবার আনতে।

মা লুডমিলাকে ডেকে আনলেন। ইগর বললো—লুডমিলা, আমার এই বন্ধুটি অনুমতি না নিয়ে জেল থেকে চলে এসেছেন। এঁর খিদে পেয়েছে, এঁকে কিছু খেতে দাও। তারপর এঁকে দু-একদিনের জন্য লুকিয়ে রেখো।

লুডমিলা বললো—তুমি চুপ কর, তোমার পক্ষে বেশী কথা বলা ভাল নয়। এখনও তো ওষুধ খাওনি দেখছি। এখনি হাসপাতালের লোক আসবে।

—তাহলে হাসপাতালেই যাচ্ছি ?

—আমিও সেখানে যাব তোমার সঙ্গে। এখন চুপ কর।

লুডমিলা ইগরের গায় কম্বলখানি ভাল করে চাপা দিয়ে দিল।

তারপর মাকে বললো—ওকে এক দাগ ওষুধ খাইয়ে দিন। আমি আসছি। একদম কথা বলতে দেবেন না।

ভেসবকে নিয়ে লুডমিলা পাশের ঘরে চলে গেল।

মা ওষুধ খাইয়ে দিলেন, ইগর বললো—আমি মরবো এটা সুনিশ্চিত। পৃথিবীতে যখন এসেছি, মরতে তখন হবেই।

একটু পরেই লুডমিলা ফিরে এলো, মাকে বললো—ভেসবকে এখনি এখান থেকে চলে যেতে হবে, তার জন্য এখনি একটা পোষাক কিনে আনুন।

মা পোষাক কিনতে বেরুলেন।

নূতন পোষাক পরে ভেসব পথে বেরুলো। মা তাকে সহর পার করে দিয়ে এলেন।

বাড়ী ফিরতেই নিকোলাই বললো—ইগরকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে, অবস্থা খুব খারাপ, তুমি একবার সেখানে যাও।

মা হাসপাতালে গিয়ে দেখলেন, ইগরকে আড় করে বসিয়ে রাখা হয়েছে, শোয়া নিষেধ। ইগর মাকে দেখে বললো—মৃত্যু আসছে, কিন্তু ধীরে ধীরে। আমি বড় ভাল লোক ছিলাম, আমাকে নিয়ে যেতে তার কুণ্ঠা হচ্ছে।

মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, বললেন—ঘুমাও।

ইগর ঘুমিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মারা গেল।

লুডমিলা বললো—ওর সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। দু'জনে একসঙ্গে নির্বাসনে গিয়েছিলাম, একসঙ্গে ছিলাম জেলে। ওর মনে ছিল অফুরন্ত আনন্দ, দুঃখ কখনও ওকে অভিভূত করতে পারেনি। জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছে, কিন্তু কখনও মুখ ফুটে বলেনি। শরীর ভেঙ্গে গিয়েছিল, কিন্তু কখনও দয়া বা সেবার প্রত্যাশা রাখেনি। ও ছিল আমার গুরু, আমার পথ-প্রদর্শক। বন্ধু, বিদায়!

লুডমিলার হাত ধরে মা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

পরদিন সকালবেলা হাসপাতালের দরজায় জনকয়েক লোক জমায়েৎ হোল। মা'ও ছিলেন তাদের মধ্যে।

রাস্তার অপর দিকে ছিল রিভলভারধারী একদল পুলিশ।

বন্ধুরা ইগরের শবাধার কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে এলো, জনতা টুপি খুলে সম্মান জানালো।

ফুল আর লাল ফিতে দিয়ে কফিনটি ঢাকা ছিল। সহসা পুলিশের দল এগিয়ে এসে শবাধারটি ঘিরে ফেললো, অফিসার হুকুম দিল—লাল রিবন সরিয়ে নেওয়া হোক!

জনতা চঞ্চল হয়ে উঠলো। পুলিশের হুকুম কেউ মানলো না। লাল রেশমী ফিতেগুলি বাতাসে উড়তে লাগলো। পুলিশ-অফিসার হুকুম দিল—ফিতে কেটে ফেলো।

একজন পুলিশ তলোয়ার দিয়ে ফিতেগুলি কেটে ফেললো।

জনতা নীরবে এই অপমান সহ্য করলো, মাথা নীচু করে এগিয়ে চললো কফিন নিয়ে।

জনতা গোরস্থানে এসে পৌঁছালো, শবাধার নামানো হোল। পুলিশ সঙ্গেই ছিল, অফিসার হুকুম জারি করলো—এখানে কেউ কোন বক্তৃতা দিতে পারবে না।

একজন যুবক ধীরভাবে এগিয়ে এলো, বললো—আমি দু'চারটে কথা বলবো। বন্ধুগণ, আমাদের শিক্ষাদাতা পরলোকগত বন্ধুর কবরের উপর দাঁড়িয়ে আসুন আমরা নীরবে এই শপথ গ্রহণ করি,—যা ইনি শিখিয়ে গেছেন তা আমরা যেন কখনও না ভুলি। যে স্বেচ্ছাতন্ত্র আমাদের দেশের সর্বনাশ করছে আমরা যেন তাকে কবর দিতে পারি!

পুলিশ-অফিসার চীৎকার করে উঠলো—ওকে গ্রেপ্তার কর!

জনতা চীৎকার করে উঠলো—রাজার স্বৈরাচার ধ্বংস হোক্!

পুলিশ যুবকটিকে ঘিরে ধরলো। জনতা তাকে ছিনিয়ে নেবার জন্য এগিয়ে গেল।

পুলিশ চালালো সঙ্গীন, চালালো তলোয়ার।

শোনা গেল চীৎকার, আর্তনাদ। তার মধ্যে সেই যুবকটির কণ্ঠ শোনা গেল—বন্ধুগণ, শান্ত হও, আমাকে যেতে দাও!

যুবকের কথায় জনতা শান্ত হোল।

মা দেখলেন জনতার মাঝে নিকোলাই চীৎকার করছে—তোমরা কি বুদ্ধিশুদ্ধি হারালে? থামো!

নিকোলাইয়ের একখানি হাত রক্তে লাল হয়ে গেছে।

সোফিয়া ভীড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে এলো, তার হাতে একটি কিশোর ছেলে। মুখে আঘাত লেগে রক্ত ঝরছে। বললো—রুমাল দিয়ে একে ব্যাণ্ডেজ করে দিন, বাড়ী যান। আপনাকে দেখতে পেলেই গ্রেপ্তার করবে, এখনি এখান থেকে চলে যান।

মা ছেলেটিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বাড়ীতে যখন পৌঁছলেন তখন তাঁর সর্বাঙ্গ রক্তের দাগে ভরে গেছে। তিনি দেখলেন সোফিয়া তার আগেই বাড়ী পৌঁছে গেছে, ডাক্তারও নিয়ে এসেছে। ডাক্তার দেখে বললেন—মাথায় মুখে চোট লেগেছে, তবে খুব সাংঘাতিক নয়।

মায়ের মনে হয়, আজকের দিনটা যেন একটা মস্ত বড় দুঃস্বপ্ন।

মা জেলে গেলেন পাভেলের সঙ্গে দেখা করতে।

কথায় কথায় বললেন—আহাঃ, সেদিন ইগর মারা গেল। কবর দেবার সময় পুলিশের সঙ্গে হোল মারামারি, একজন লোক ধরাও পড়লো।

সামনে জেলের সরকারী সাহেব বসে ছিল, বললে—ওসব কথা থাক্, ওসব কথা বলা চলবে না।

মা বললেন—আমি বলছিলাম সেদিন একটা মারামারি হয়েছিল, সেদিন একজনের মাথাও ফাটিয়ে দিয়েছিল।

—হয়েছে হয়েছে. থাম! ঘর-সংসারের কথা ছাড়া আর কোন কথা বলতে পারবে না।

সাহেব যেই পিছন ফিরলো, মায়ের মুঠার মধ্যে ছিল আইভানোভিচের লেখা একখানি চিঠি, সেটি তৎক্ষণাৎ গুঁজে দিলেন পাভেলের হাতে। তারপর বললেন—কি কথা বলবো তাতো বুঝতে পারছি না।

সাহেব বললো—বলার কথা না থাকলে দেখা করতে এসেছিলে কেন?

মা চলে এলেন।

সোফিয়া এসে বললো—আবার বই নিয়ে রিবিনদের গাঁয়ে যেতে হবে।

পরদিন ভোরেই মা বেরিয়ে পড়লেন। গাড়ী করে সেখানে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হলো। একটা সরাইখানায় এসে উঠলেন।

সরাইখানার সামনেই গাঁয়ের টাউন-হল্। মা দেখলেন টাউন-হলে বেশ ভীড় জমেছে, শুনলেন—এইমাত্র একজন চোর ধরা পড়েছে।

তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন ব্যাপার দেখবার জন্য। বারান্দায় আসতেই তাঁর চোখে পড়লো দু'জন পুলিশ রিবিনকে পিছমোড়া করে বেঁধে আনছে। মা থমকে দাঁড়ালেন।

ভীড়ের মধ্যে থেকে একটি স্ত্রীলোক বলে উঠলো—চোরটার চেহারা কি ভয়ঙ্কর !

রিবিন গম্ভীর কণ্ঠে বললো—ভাইসব, আমি চোর নই। আমি চুরি করি না। কারও বাড়ীতে আগুনও লাগাইনি। আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলাম তাই এরা আমাকে ধরে এনেছে। যে সব বইয়ে সত্যি কথা লেখা আছে, সেই সব বই আমি চাষীদের পড়তে দিয়েছি বলেই ওরা আমাকে ধরেছে। আমিও একজন চাষী। এই সব বইয়ে যা লেখা আছে তার প্রতিটি কথা সত্যি, সেই কথা প্রচার করার জন্য ওরা আমায় মারছে। ওরা জানতে চায় কোথা থেকে আমি বইখানি পেয়েছি। সেইজন্য ওরা আমাকে নির্যাতন করেছে, আরো নির্যাতন করবে।

সার্জেণ্ট ছুটে এলো, হুমকি দিয়ে বললো—এত ভীড় কিসের ?

তারপর রিবিনের চুলের মুঠি ধরে এক ঝাঁকানি দিয়ে বললো—কি বলছিস্, পাজী, বদমায়েস !

রিবিন বললো—ভাইসব, দেখে রাখো।

—চোপ্‌রাও—বলে সার্জেণ্ট এক ঘুসি মারল তার মুখে। রিবিন ঘুরে পড়ে গেল, তবু বললো—ওরা এমনি করে মানুষের হাত পা বেঁধে তাকে মারে।

ক্ষিপ্ত হয়ে সার্জেণ্ট রিবিনকে মারতে লাগলো ঘুসির পর ঘুসি।

এবার শান্ত জনতার মাঝে সাড়া জাগলো, একজন বলে উঠলো—ও রকম করে মারবার কি দরকার ? ছেড়ে দাও !

রিবিন বললো—ভাই সব, তোমরা মানুষকে অন্ন জোগাচ্ছ, তবু তোমরাই আজ শুকিয়ে মরছ ! ভাইসব, আমি তোমাদেরই দাবি নিয়ে দাঁড়িয়েছি, এই দেখ আমার রক্ত। এই রক্ত পাত হয়েছে সত্যের জন্য। মালিকেরা সত্য সইতে পারে না, ওরা চায় চিরদিন তোমাদের এমনি ভাবে দাবিয়ে রাখতে।

চাষীরা বললো—সত্যি কথা ! কিন্তু ওকে ধরিয়ে দিল কে ?

পুলিশ বললো—পাদ্রী।

জনতা চীৎকার করে উঠলো—ওর হাত খুলে দাও।

ভয় পেয়ে পুলিশ রিবিনের হাত খুলে দিল।

এমন সময় পুলিশের বড়কর্তা এসে পড়লো, বললো—ব্যাপার কি? হাত খোলা কেন?

—হুজুর, এরা হাত খুলে দিতে বলছিল, বড় গোলমাল করছিল।

—কারা গোলমাল করছিল? কে? ভাগো সব!

চাষীরা কিন্তু পালালো না।

—বাঁধো ওর হাত!

রিবিন বললো—কেন আমার হাত বাঁধবে? আমি তো তোমাদের সঙ্গে মারামারি করছি না।

—কি বলছিস!—বলে বড়কর্তা রিবিনের মুখে মারলো এক ঘুসি।

রিবিন বললো—তুমি কোন্ অধিকারে আমাকে কুকুরের মত মারছ?

বড় কর্তা মারলো আরেক ঘুসি। রিবিন মাথা নামিয়ে নিল। ঘুসি লাগলো না। টাল সামলাতে না পেরে বড় সাহেব পড়ে গেল। চাষীরা হেসে উঠলো।

বড়কর্তা ডাকলো—নিকিতা!

একজন যণ্ডা চাষী এসে সামনে দাঁড়ালো।

বড়কর্তা বললো—এই শূয়োরটাকে বেশ করে ঘা কতক দাও।

নিকিতা এগিয়ে গিয়ে মৃদু আঘাত করলো রিবিনের মাথায়।

রিবিন বললো—ভাইসব, তোমরা দেখ, ওরা আমাদের দিয়েই আমাদেরকে নির্যাতন করে। তোমরা দেখ, এ কেন আমাকে মারতে চায়?

চাষীরা সাড়া তুললো—নিকিতা, হতভাগা, নরকে যাবি!

বড়কর্তা বললো—আমার হুকুম, মারো ওকে।

নিকিতা বললো—আমি পারবো না।

—কী!—বড়কর্তা তখন রিবিনকে মাটিতে ফেলে দিয়ে মারতে লাগলো লাথির পরে লাথি।

জনতা এবার ক্ষেপে উঠলো, বললো—ওকে এমন করে মারছ কেন? ও অপরাধ করে থাকে, আদালতে নিয়ে গিয়ে বিচার কর।

ক'জন এগিয়ে গিয়ে রিবিনকে মাটি থেকে তুললো। রিবিন মুখের রক্ত মুছে জনতার পানে তাকালো। মায়ের চোখের উপর তার চোখ পড়লো।

রিবিন বললো—ভাইসব, আমি ছুনিয়ায় একা নই। সত্যকে ওরা বাঁধতে পারবে না। আমি গেলেও আমার স্মৃতি থেকে যাবে।

একটি মেয়ে জল এনে রিবিনের মুখ ধুইয়ে দিলে।

বড়কর্তা বললো—তোমরা হাঙ্গামা করতে এসেছ, তোমাদের এত স্পর্ধা?

রিবিন বললো—তুমিই বা মারলে কেন? তুমি কি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছ?

সাহেব বললো—চুপ রও!

পুলিশ গাড়ী আনলো, রিবিনকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে তারা চলে গেল।

একজন চাষী মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, সে বললো—এখানে এই-ই ঘটছে নিত্য।

মা বললেন—তাই তো দেখছি।

চাষীটি মায়ের পানে তাকিয়ে দেখলো, বললো—আপনি কি করেন?

—আমি এইখানে এসেছি চাষাদের কাছ থেকে লেশ কাপড় কিনতে।

—ওসব এখানে সুবিধা হবে না।

হঠাৎ মায়ের কি খেয়াল হোল, বললেন—আজ রাত্রে তোমার বাড়ীতে একটু থাকবার জায়গা পেতে পারি?

—রাত্রিতে থাকবেন? তা আসতে পারেন আমার বাড়ীতে।

— সরাইখানায় আমার একটা ব্যাগ আছে, সেটা যদি নিয়ে যাও।

—বেশ, চলুন।

লোকটি মায়ের সঙ্গে সরাইখানায় এলো, ব্যাগটি হাতে নিয়ে বললো—এ যে একেবারে খালি!

তারই জীর্ণ কুঁড়েঘরে মা সেই রাত্রির মত আশ্রয় নিলেন।

সেই চাষীটি তাদের দলের লোক, মা তার কাছেই কাগজ ও বইগুলো রেখে এলেন। বলে এলেন—এই কাগজ আমাদের কাগজ। আমরা আন্দোলন করছি। সমস্ত পৃথিবী থেকে লোভ, শোষণ, ধোঁকাবাজি আমরা শেষ করবো, জনতার রাজ আমরা প্রতিষ্ঠা করবো, তখন আমাদের কাজের শেষ হবে। ভয় পেও না, সবাই এসো, সত্য প্রচার কর! নিজেদের পানে তাকাও, তিলে তিলে মরবে কেন? মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য মানুষকে সুখী করার জন্য সবাই হাতে হাত মেলাও।

বাড়ী ফিরে মা শুনলেন নিকোলাইয়ের বাড়ী সার্চ হয়ে গেছে। সে বললো—আমার আপিসে ওরা হুকুম পাঠিয়েছে, চাকরী থেকে ছাড়িয়ে দেবার জন্য। যাক বাঁচা গেল। আমার কাজ ছিল যে সব চাষীর ঘোড়া নেই তাদের নামের তালিকা করা। যাদের ঘোড়াটি পর্যন্ত নেই, তাদেরই টাকায় আমায় মাইনে দেওয়া হোত। মাইনে নিতে লজ্জা করতো। যাক, এতদিনে চাকরী যাবার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া যাবে!

মা দেখলেন ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র পুলিশ তচনচ করে গেছে। নিকোলাই হেসে বললো—ওরা সরকারের কাছ থেকে অকারণে মাইনে নেয় না, তাই দেখিয়ে গেছে। আমার বোধ হয় শীগ্গীর আবার ওরা আসবে, আমি তাই এসব আর কিছু গুছাইনি। যাক্, আপনার খবর কি বলুন?

মা বললেন রিবিনের গ্রেপ্তারের কথা। শুনে নিকোলাই উত্তেজিত হয়ে উঠলো, বললো—এই পুলিশ আর সার্জেণ্ট হোল

সয়তানের অস্ত্র। বনের পশুকে যেমন করে পোষ মানায় তেমনি করে ওদেরকে শিখিয়ে নিয়েছে। মুষ্টিমেয় একদল লোকের অধীনে অধিকাংশ মানুষ পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। রিবিনের ব্যাপারটা লুডমিলা ছাপবে, কিন্তু গাঁয়ে বিলি করবে কে ?

—কেন, আমি নিয়ে যাব।

—না। এবার যাবে ভেসবশ্চিকফ।

নিকোলাই তখনই লিখতে বসে গেল।

রাত্রে নিকোলাই মাকে গল্প শোনালো—যেসব বন্ধুরা সাই-বেরিয়ায় আছে তাদের কথা, যারা সাইবেরিয়া থেকে পালিয়ে এসে ছদ্মনামে লুকিয়ে দলের কাজ করছে তাদের কথা। মা তাদের দেখেননি, কিন্তু তাদের কাহিনী শুনতে শুনতে তাদের মহান্ রূপ মায়ের চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো।

পরদিন, তখনও সকাল হয়নি, রান্নাঘরের জানালায় কে যেন টোকা দিল। মা উঠে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কে ?

—আমি।

—আমি কে ?

—খুলুন্ বলছি।

মা দরজা খুলে দিলেন, ভিতরে এসে ঢুকলো ইগনাট, বললো—আমাদের দলের সবাইকে ধরেছে। আমি পালিয়ে এসেছি। প্রথমে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম, তারপর দু-রাত্তির ধরে হেঁটেছি। পা আর নাড়তে পারছি না।

মা বললেন—রিবিন গ্রেপ্তার হয়েছে জান।

মা তাকে বললেন রিবিনের মার খাওয়ার কথা।

তারপর গরম জলে ইগনাটের পা ধুইয়ে দিয়ে, স্পিরিট্ মালিশ করে দিলেন।

নিকোলাই রিবিন সম্পর্কে নূতন লেখা ইস্তাহারটি বিলি করার কথা তুললো।

ইগনাট বললো—আমাকে দিন, আমিই নিয়ে যাব!

মা বললেন—তুমি তো বল পুলিশকে তোমার ভয় করে।

—ভয় করি সত্যি, তা বলে কাজ করবো না? আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে ভয় হয় তবু দরকার হলে তা-ও পড়তে হবে।

নিকোলাই বললো—তোমাকে যেতে হবে না, এবার আমিই যাব।

নিকোলাই চলে গেল।

জেলখানায় গিয়ে মা দেখা করলেন পাভেলের সঙ্গে। পাভেল সকলের অলক্ষ্যে ছোট একটুকরো কাগজ মায়ের হাতে গুঁজে দিল। মা চিঠিখানি এনে নিকোলাইয়ের হাতে দিলেন। নিকোলাই পড়লো, পাভেল লিখেছে—

কমরেড, আমরা পালাতে চাই না, আমরা এভাবে পালালে সঙ্গের বন্ধুদের শ্রদ্ধা হারাবো। তার চেয়ে তোমরা রিবিনকে উদ্ধার করার চেষ্টা কর। তার জীবন এখানে দুর্বহ হয়ে উঠেছে। একটা করে ঝগড়া বাধছে আর সে শাস্তি পাচ্ছে। এরই মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা অন্ধকার সেলে আটক থাকা তার হয়ে গেছে। মাকে বুঝিয়ে বলো। পাভেল।

ঠিক হোল রিবিনকেই জেল থেকে বের করে আনা হবে।

শশেংকা নিল সব ভার।

দু'দিনের মধ্যে শশেংকা সব ঠিক করে ফেললো। তৃতীয় দিনে এসে বললো—সব ঠিকঠাক, আজই একঘণ্টার মধ্যে।

নিকোলাই বললো—এতো শীগগীর!

শশেংকা বললো—বাকি ছিল একটা লুকোবার জায়গা ঠিক করা আর একটা নতুন পোষাক ঠিক করা, বাকি সব ভার নিয়েছে বুড়ো ইয়াকভ। নিকোলাই আর আমি ছদ্মবেশে ওখানে যাব, গায়ে একটা ওভারকোট আর মাথায় একটা টুপি পরিয়ে রিবিনকে আমরা নিয়ে আসবো।

মা বললেন—আমিও যাব।

প্রথমে তারা রাজী হোল না, কিন্তু মা যাবেনই। নিকোলাই বললো—এক সঙ্গে কিন্তু যাওয়া চলবে না।

একঘণ্টা পরে মা একা জেলখানার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন ঝড় উঠেছে, ধূলায় সব অন্ধকার হয়ে গেছে। পাশেই এক নির্জন গোরস্থান। দু'জন সৈনিক চলেছিল সেই পথ দিয়ে, মা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন—বাবা, আমার ছাগলটাকে তোমরা দেখেছ ?

—না।

তারা চলে গেল, মা এসে পড়লেন নির্দিষ্ট জায়গায়। তাঁর গা কেঁপে উঠলো। দেখলেন একটা বুড়ো লোক একটা মই কাঁধে নিয়ে আসছে। মইখানি সে লাগালো জেলের পাঁচিলের গায়। মই দিয়ে উপরে উঠে সে কিসের ইসারা করলো। তারপর নেমে এলো। তার পিছনে পাঁচিলের উপর দেখা গেল রিবিনকে, রিবিনের পিছনে আরেকজন। তারা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে, পথের উল্‌টা দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর মায়ের কানে এলো জেলের মধ্যে বাঁশির শব্দ, গোল-মাল, ছুটোছুটি ও চীৎকার।

একজন পুলিশ ছুটে এসে মাকে বললো—এই বুড়ি, এখান দিয়ে দুটো লোককে দৌড়ে যেতে দেখেছিস্? একজনের মুখে দাড়ি আছে।

—দেখেছি হুজুর, তারা ওই দিকে পালালো—মা উল্‌টা পথ দেখিয়ে দিলেন।

পুলিশ ছুটলো সেই দিকে।

মা-ও বাড়ীর পথ ধরলেন।

.

সপ্তাহখানেক পরে পাভেলের বিচার হোল। মা গেলেন আদালতে। আদালতে ভীড় হয়েছিল খুব।

আদালতের একপাশে জালের ঘরের মধ্যে পাভেল, আঁদ্রে ও আরো অনেককে দেখা গেল।

জজেরা এলেন। বিচার স্বুরু হোল।

উকিলেরা এদিক ওদিক করতে লাগলো।

সহসা পাভেল গম্ভীর কণ্ঠে বললো—এখানে আসামী বা বিচারক বলে কেউ নেই, আছে শুধু বন্দী আর বিজেতা।

বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন—আঁদ্রে নাখোদকা, তুমি দোষ স্বীকার করছ ?

আঁদ্রে বললো—কি দোষ আমি করেছি যে স্বীকার করবো ? কাউকে খুন করিনি, চুরিও করিনি। যে জীবনধারায় চললে মানুষ খুন করতে—চুরি করতে বাধ্য হয়, আমি দাঁড়িয়েছি তার বিরুদ্ধে।

বিচারক বললেন—অত কথা শুনতে চাইনা, শুধু বল 'হ্যাঁ' কি 'না'।

আঁদ্রে বললো—ফিদর, তুমি উত্তর দাও।

পাশে থেকে ফিদর বলে উঠলো—এদের অধিকার নেই আমাদের বিচার করার। এ মামলা বে-আইনী, আমরা এদের কর্তৃত্ব মানি না।

তবু বিচার চললো।

সাক্ষ্য নেওয়া হোল।

শেষে আসামীদের পক্ষ থেকে একজন উকিল যখন কিছু বলতে উঠেছে, এমন সময় পাভেল বলতে স্বুরু করলো—আত্মপক্ষ সমর্থন করতে আমি চাই না কিন্তু কয়েকটা কথা বুঝিয়ে বলতে চাই। আমরা সমাজতন্ত্রী, ব্যক্তিগত সম্পত্তির আমরা চিরশত্রু। ব্যক্তিগত সম্পদের জন্যই মানুষ মানুষকে আঘাত করে, নিজেদের অনাচার অবিচার প্রবঞ্চনা ও মিথ্যাচারকে ঢাকবার জন্য মিথ্যা কথা তৈরী করে। এই সমাজ-ব্যবস্থা মানুষকে মনে করে একটা অর্থ বাড়াবার যন্ত্র মাত্র। আমরা এই সমাজ-ব্যবস্থাকে মানি না। আমরা মজুর, দুনিয়ার সব কিছুই আমরা তৈরী করি। আমাদের দিয়ে সবাই কাজ করিয়ে নেয়

নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। আমরা চাই সকলের অধিকার সমান হবে, প্রত্যেককেই নিজের হাতে শ্রম করতে হবে। যতদিন একদল লোক শুধু খেটে যাবে, আরেক দল লোক হুকুম চালাবে, ততদিন আমরা থাকবো বিদ্রোহী। এই ব্যবস্থা একদলকে ক্রীতদাস করে তুলেছে, মানুষ থেকে মানুষকে তফাৎ করে দিয়েছে, এই পার্থক্য আমরা দূর করতে চাই! আমরা চাই ব্যক্তিগত মালিকানা ধ্বংস হোক।

পাভেল বললো আমাদের এই লড়াই চলবে যতদিন না আমরা জিতি। সত্যের দাবী ন্যায়ের দাবী নিয়ে দুনিয়ার মজুর আজ এক হচ্ছে। নিষ্ঠুরতা ও নাচভা দিয়ে তাদেরকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না আপনারা। আপনারা লোভ, মিথ্যা আর শঠতা দিয়ে যে দানবের দুনিয়া তৈরী করেছেন তা থেকে আমরা মানুষকে মুক্ত করবো। আমরা নতুন ক'রে জগৎকে গড়ে তুলবো!

পাভেল বসলো, উঠলো আঁদ্রে।

বিচারক বললেন—মামলা সম্পর্কে কিছু বলার থাকে তো বল, নাহলে অন্য কোন কথা নয়।

—তাহলে আপনারা সত্যি বিচারক—স্বাধীন এবং সাধু—

—বাজে কথার দরকার নেই—

—বেশ মনে করুন, দুটি দল আছে, একদল বলছে যে সব লুঠে নিল। আরেকদল বলছে আমাদের শক্তি আছে কাজেই লোটবার অধিকারও আছে—

—গল্প শুনতে চাইনা, তুমি বস।

এবার বলতে সুরু করলো সামোলাভ—সরকারী উকিল বললো যে আমরা সভ্যতার শত্রু। জিজ্ঞাসা করি—কি এই সভ্যতা? এই সভ্যতা মানুষকে এমন জায়গায় এনে ফেলেছে, যে সে চুরী করে, মদ খায়। সত্যি, এই সভ্যতার আমরা শত্রু। আমরা চাই আরেক

সভ্যতা, সেই সভ্যতা যারা সৃষ্টি করবে তোমরা তাদের নির্যাতন কর, নির্বাসনে পাঠাও, নির্যাতনে পাগল করে দাও।

—চুপ কর!

আর কেউ কিছু বললো না।

বিচারক আসাসীদের সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দণ্ড দিলেন।

বন্দীরা বন্ধু ও আত্মীয়দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রক্ষীদের সঙ্গে চলে গেল। আঁদ্রে ও পাভেলের দিয়ে তাকিয়ে ক্ষুব্ধ চিত্তে মা আদালত থেকে বেরিয়ে এলেন।

ক্লান্ত নগরীর উপর তখন রাত্রির ছায়া এসে নেমেছে। পথে আলো, আকাশে তারা।

শশেংকার সঙ্গে মা কথা বলছিলেন, নিকোলাই এলো ব্যস্ত ভাবে। বললো—গোয়েন্দা আমার পিছু নিয়েছে, আজই আমাকে বোধ হয় গ্রেপ্তার করবে। শশেংকা আর এখানে এসো না। এই নাও, পাভেলের জবানবন্দী লুডমিলাকে দেবে, শিগগীর যেন ছাপিয়ে ফেলে। আর মা, তোমারও এখানে আর থাকা চলবে না, তুমি ধরা পড়লে ইস্তাহার বিলি করবে কে? তুমি আজ রাত্রে লুডমিলার কাছে চলে যাও। আমি ততক্ষণ কাগজপত্র সব পুড়িয়ে ফেলি।

দেরাজ খুলে সে কাগজপত্র সব বের করতে লাগলো। শশেংকা সেগুলি পোড়াতে লাগলো স্টোভে।

নিকোলাই বললো—আমার বিরুদ্ধে ওদের অনেক অভিযোগ। অন্ততঃ ছ'মাসের আগে ছাড়বে না। যাক্, তোমরা আর দেরী করো না, যাও।

মা তখনই পাভেলের বক্তৃতাটি নিয়ে লুডমিলার কাছে গেলেন। লুডমিলা স্টোভের আলোয় বক্তৃতাটি পড়লো, তার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললো—আপনি এখন একটু ঘুমিয়ে নিন, আমি ততক্ষণ এটা কম্পোজ করি।

দেয়ালের একট ছোট্ট দরজা খুলে লুডমিলা অদৃশ্য হোল।

মা শুয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালে মা খবর পেলেন—নিকোলাইকে রাত্রে পুলিশ সত্যই ধরে নিয়ে গেছে। লুডমিলা বললো,—একটা ছেলেকে পাঠিয়ে ছিলাম খবর নিতে। পুলিশ সেখানে মাকেও খুঁজেছিল।

শুনে মা হাসলেন। বললেন—আমাকে ধরলে কোন লোকসান নেই। তবে তার আগে পাভেলের বক্তৃতা-ছাপা কাগজখানা বিলি করে যেতে চাই।

পাভেলের বক্তৃতাটি ইতিমধ্যে ছাপা হয়ে গেছে। সেগুলো গাঁয়ে গিয়ে দিয়ে আসতে হবে, মা বললেন—আমিই নিয়ে যাব।

মা লুডমিলাকে বললেন— আমাদের ছেলেরা বেরিয়েছে পৃথিবীর পথে, যা-কিছু মিথ্যা যা-কিছু অন্যায় যা-কিছু হীন—সব তারা পায়ের তলায় দলে চলেছে। দুনিয়া থেকে তারা মানুষের সব দুর্ভাগ্য সব অসন্তোষকে মুছে ফেলবে। তাদের শক্তি অজেয়, তারা আনবে নতুন প্রভাত। সেই আলোয় সকল মানুষের আসবে কল্যাণ, পবিত্র করে তুলবে সব-কিছু। যতদিন তা না হবে ততদিন বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। তাদের জয় হোক।

দুপুর বেলা মা গেলেন স্টেশনে।

হাড় কাঁপানো শীত, পথ বরফে ঢাকা। ট্রেন আসতে তখনও কিছু দেরী ছিল, মা তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রামাগারে গিয়ে বসলেন। মায়ের পাশে ছিল একটি হল্‌দে রঙের সুটকেশ।

সহসা একটি লোক এগিয়ে এসে বললো—তুই এই ব্যাগটা চুরি করেছিস্, তুই চোর!

মা বললেন—আমি চোর নই। মিথ্যে কথা!

—হ্যাঁ, তুই চোর। বুড়ো হয়ে মরতে চললি, তবুও—

—খবরদার!

চারিপাশে দু'চারজন এগিয়ে এলো, বললো—কি হয়েছে?

—এই বুড়ী চোর!

মা বললেন—বন্ধুগণ, আমি চোর নই। আমার ছেলে প্রাভেল রাজনৈতিক অপরাধে কাল নির্বাসনে গেছে। সে একটা জবানবন্দী দিয়ে গেছে আদালতে। এই তার সেই ছাপানো বক্তৃতা, আমি তোমাদের দিচ্ছি, তোমরা পড়ে দেখ, ভেবে দেখ! সত্যি মিথ্যে বুঝবে।

মা স্যুটকেশ খুলে কাগজগুলি ছুঁড়ে দিতে লাগলেন জনতার মাঝে। কাগজগুলি ছড়িয়ে পড়লো, যে পেলে সেই পকেটে ভরলো।

মা বললেন—গরীব খেটে মরে, সারাদিন খেটে তারা কি পায় জান? অনাহার, ব্যাধি আর নির্যাতন। মাথার উপর বসে আছে ধনী, মালিক, জমিদার আর মহাজন। তাদেরই হাতে আছে পুলিশ, সৈন্য আর আইন। আমাদের পয়সায় ওরা নবাবী করছে আর আমাদের জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

একজন পুলিশ এসে মায়ের হাত থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিলে, কিন্তু সেটা তখন খালি হয়ে গেছে।

মা বলে চললেন—ওরা তোমাদের সর্বস্ব লুটে নিচ্ছে। তোমরা সকলে এক হয়ে দাঁড়াও। ওঠো, জাগো, মজুর ভাইসব, নব জীবনের

পথে এগিয়ে চল—সবাই এক হও, এক বিরাট শক্তি গড়ে তোল।

একদল পুলিশ ভীড় ঠেলে এগিয়ে এলো। মা একটি ঘুসি খেয়ে টলে পড়ে গেলেন। জনতার উপরেও চললো মার।

মা উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—সবাই এক হও! কাউকে ভয় করো না, সারা জীবন ধরে যা সইছ তার চেয়ে বেশী কষ্ট কেউ দিতে পারে না।

মায়ের গালে একটি চড় পড়লো। চোখ ধোঁয়া হয়ে গেল। মুখে রক্তের নোনা স্বাদ। মা বললেন—রক্তের বন্যা বইয়ে দিলেও সত্যকে ডোবাতে পারবে না। আমার আত্মা জীবন্ত---

পুলিশরা ধাক্কা মারতে মারতে মাকে এনে তুললো বাইরে একখানি গাড়ীতে।

মা বললেন—নিজেদের পাপের বোঝা নিজেরাই বাড়িয়ে তুলছো, এই ভারেই তোমরা একদিন নুয়ে পড়বে। সব মানুষের ঘৃণা, সব পাপ জমছে—

একজন পুলিশ মায়ের গলা টিপে ধরলো।

দম বন্ধ হয়ে আসছে তবু অস্ফুট স্বরে মা বললেন—আহাম্মক হতভাগার দল! দুঃখ হয় তোদের জন্য!

আর কথা বলতে পারেন না।

গাড়ী চলে গেল।

একটা কান্নার রেশ শোনা যায়।

# আমাদের বই

**দেশবিদেশের লেখা : ৩·৫০**

॥ মনোরম গুহ-ঠাকুরতা ॥

বিশ্বসাহিত্যে ছোটদের জন্য যত নামকরা সেরা বইয়ের গল্প আর তার লেখক-লেখিকার বিচিত্র জীবনকথা। যে সব ছেলেমেয়ে বেশি কিছু জানতে চায় ও পড়তে চায় তাদের জন্য একখানি অদ্বিতীয় বই। বাংলা কিশোর-সাহিত্যে এই ধরণের বই আর নেই। প্রত্যেক লেখক-লেখিকার একখানি ছবি বইখানিকে অনন্যসাধারণ করেছে।

**আজব দেশের যাদুকর : ৬·০০**

॥ জয়ন্ত কুমার ভাদুড়ী ॥

মার্কিন লেখক লিম্যান ফ্রাংক বম্-এর বিশ্ব-বিখ্যাত বই 'উইজার্ড অফ ওজ।' এই শতকের গোড়ার দিকে বইখানি ইংরাজি সাহিত্যে সাড়া তুলেছিল। সেই বইয়ের সার্থক অনুবাদ করেছেন জয়ন্তবাবু। এই বইখানি এতদিন কেন যে বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়নি, সেইটায় আশ্চর্য। যথেষ্ট ছবি দিয়ে সুদৃশ্য ও শোভন।

এই সিরিজে আরও

**নামকরা বিদেশী বই**

**প্রতিমাসে এক একখানি বেরুচ্ছে।**